

ଅନ୍ୟା, ୨-୪

ମିତ୍ର
ମିତ୍ର

୪

ବୁଦ୍ଧି ଓ ମନୋବଳ । ଅନ୍ୟା-ଭିତ୍ତି ୧୯୮୮



আমাদের কাজ ত্বরান্বিত হয়েছে জনসাধারণ আর্থিক অবস্থা ও জীবন ধারণের মান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে

আমাদের জীবনে বিদ্যুৎ এক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। আজ বি
তের যা চাহিদা এবং গুরুত্ব ভবিষ্যতে তা আরও বাড়বে।
আমাদের প্রতিটি উৎপাদন কেন্দ্রে, বহু বিস্তৃত বস্টন
সঞ্চালন ব্যবস্থার অন্তর্গত প্রতিটি শহর এবং গ্রাম গ্রামাঞ্চ
চলছে এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বর্তমান ও ভবিষ্যতের
চিন্তা করে এই কর্মযজ্ঞ হয়েছে সুদূর প্রসারী। সমগ্র প
বঙ্গে সাড়ে ন' লক্ষ গ্রাহকের স্বার্থে প্রতিটি উৎপাদন
আমরা এনেছি সর্বাবুনিিক কারিগরির প্রয়োগ, প্রতিটি
কের স্বার্থে আজ আমাদের সেবা হয়েছে আরো নির্ভরযোগ্য
আমাদের কর্মোদ্যম পশ্চিমবঙ্গের প্রায় প্রতিটি এ
আজ বিস্তৃত। আমাদের লক্ষ্য সুনির্দিষ্ট এবং সেই
সত্তর পৌছবার জন্য আমরা আমাদের কাজ ত্বরান্বিত ক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ

পশ্চিমবঙ্গের জীবনের অংশ

সাহিত্য সৈকত

P 36,210

বর্ষ ৮ □ সংখ্যা ১ □ অক্টো-ডিসেম্বর '৮৮ (শারদীয়)

—: সূচি :—

❶ প্রবন্ধ / সাক্ষাৎকার

বিবেকানন্দের কথা—হরপ্রসাদ মিত্র, আমার মধ্যে যে আদিষ্ট
আছে যে ব্রহ্মহু আছে সেইটি হচ্ছে বিবেকানন্দ—স্বামী জয়ানন্দ,
ঔষুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখা নয়, নিজের ক্যারিয়ার তৈরী
করা নয়—স্বামী উমানন্দ, হিজেহুল্লাল : জীবন ও কাব্য—
কাকলি ভট্টাচার্য

পৃ: ১০-১৬

❷ গল্প / লোকভাষার গল্প

অতিথি নিবাস—গৌর বৈরাগী

পৃ: ১-৮

চোরাচেটে—শতরু মজুমদার, লোটনৌ—সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী

পৃ: ৩৭-৪৭

❸ কবিতা / লোকভাষার কবিতা

দৈশানচন্দ্র মিশ্র—উজ্জ্বল ব্রমার মুখোপাধ্যায়, মধুসূদন পাণ্ডা,
নরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সৃজিৎ কুমার রায়, স্বপন রায়।

পৃ: ৬

❹ সম্পাদকীয়

প্রচ্ছদ : কাকলি ভট্টাচার্য।

এক ন জ র

আয়তন — (১৯৮১ সালের আদমশুমারী ঘাত)

৩৯০৯ বর্গ কিঃমিঃ

লোক সংখ্যা —

(১৯৮১ সালের আদম-

শুমারী ঘাত পুরুষ ও মহিলা সহ)-২৯, ৭৭, ০১০ জন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়—২৫০৭

মাধ্যমিক বিদ্যালয়—১৯২

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়—৫০

নিম্নতর উচ্চ বিদ্যালয়—১৫১

গ্রন্থাগার সরকারী—১১৫

গ্রন্থাগার বেসরকারী—৬২

প্রধান ফসল

ধান, পাট, গম, সব্জি।

তীর্থস্থান

মামাপুর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর।

দর্শনীয় স্থান

কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী, শিবনিবাস, বঙ্গাল টিবি, পলাশী রণক্ষেত্র।

অতিথি ভবন :— কৃষ্ণনগর সার্কিট হাউস, পৌর অতিথিশালা,

স্বকপগঞ্জ বাংলো, পলাশী বাংলো, বেথুয়াডহরী বন-বিভাগের

অতিথিশালা, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, জেলা পরিষদ বাংলো।

নদীয়া জেলা

কৃষ্টি ও সংস্কৃতি : কৃষ্টি ও সংস্কৃতির পীঠস্থান এই নদীয়া জেলা ।
কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবন, রানাঘাট রবীন্দ্রভবন, কল্যাণী টাউন ক্লাব,
শান্তিপুর লাইব্রেরী হল, চাকদহ শ্যামাপ্রসাদ মুক্তাঙ্গন ।
করিমপুর সংস্কৃতি হল ।

বিশ্ববিদ্যালয়—২

মহাবিদ্যালয়—১০

কুটির শিল্প

মেটিয়ারী, ধর্মদা, কাঁদোয়া ।

শংখ শিল্প :—বালিয়াডাঙ্গা (করিমপুর)

মৎশিল্প—কৃষ্ণনগর (পৃথিবীখাত)

তঁাতশিল্প (হস্তচালিত)—বালিয়া, শান্তিপুর, বরদীপ,
রানাঘাট । হস্তচালিত তঁাত : বীরনগর, রানাঘাট ।

হস্তচালিত গেক্সিশিল্প—শান্তিনগর ।

পোরসৎস্থা — ৬টি ।

খানা — ১৮টি ।

নদযাত্রা

জলঙ্গী, ভাগীরথী, মাধান্তাঙ্গা, চূর্ণী, ইছামতী ও নৈরবী ।

পাট-(উৎকৃষ্টমানের)—

করিমপুর, তেহট্ট, কৃষ্ণনগর । তার মধ্যে করিমপুরের মান ভাল ।

সাক্ষরতার হার— ৩৪.৭৭ শতাংশ ।

ক্রমিক সংখ্যা ২৭/৮৮-৮৯ আই এণ্ড সি এনদীয়া তাং-২৯-৯-৮৮

স্বাক্ষরিতঃ ১৯৮৮/৮৯

॥ জাতীয় ঐক্য সংহতির শপথ ॥

স্বাধীনতার ৪১ বছর পরেও আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য অমুযায়ী দারিদ্র ও শোষণমুক্ত সমাজ গঠন করে দেশের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্য, সাম্য ও সৌভ্রাতৃ গড়ে তোলা যায়নি। এই পরিণাম দেশের বিভিন্ন স্থানে জাতি, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে হানাহানি, দেশের অখণ্ডতা বিপর্যয় করে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির দাপাদাপি। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে নানাভাবে ইচ্ছন দিচ্ছে জনবিরোধী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি।

দারিদ্র্য ও শোষণমুক্তির জন্য চাই মেহনতী মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম। জাতি, ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে গড়া অনৈক্য বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ আমাদের মূল লক্ষ্যের পরিপন্থী। তাই স্বাধীনতা দিবসে আমরা জাতীয় ঐক্য, সংহতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার শপথ গ্রহণের জন্য সকলকে আহ্বান জানাই।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা : ২৩/৮৮-৮৯ ১৬. ৮. ৮৮.

জোর করে চাঁদা আদায় করবেন না

জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করা আইনত দণ্ডনীয় একটি অপরাধ। আসন্ন শারদোৎসবে সার্বজনীন পুজা-কমিটিগুলির কাছে আমাদের আহ্বান : আপনারা জোরজবরদস্তি করে চাঁদা আদায় থেকে বিরত থাকুন। কেউ যদি আসন্ন শারদোৎসবে চাঁদা আদায় করতে এসে আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার বা জোর-জুলুম করে — তা সে শহরেই হোক গ্রামেই হোক কি জাতী, সড়কের উপরেই হোক, এদের যে কোন একজনের সঙ্গে ঘোড়াযোগ করে তত্ত্বিবা জানান।

স্থানীয় থানার ও সি ; সার্কেল ইন্সপেক্টর বা সি আই ; মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এস ডি পি ও ; অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার ;

জেলা পুলিশ সুপার ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশ সদর (মহাকরণ, ফোন : ২৫-৭৬৫৭) অথবা ডাইরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ (মহাকরণ, ফোন : ২৫-৮০৮০)

পুলিশ জুলুমকারীর বিরুদ্ধে তৎক্ষণাত্ কড়া ব্যবস্থা নেন।

মমেন রাধাবেন

ইচ্ছা করলে আগমার পরিচিতি গোপন রাখতে পারেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

তপসিলৌ জাতি ও উপজাতি চাকুরী প্রার্থীদের জন্য বিশেষ কম' বিনিয়োগ কেন্দ্র

- ১। টেনোগ্রাফার ১। টাইপিষ্ট ৩। অভিজ্ঞ ক্লার্ক ৪। একাউন্ট্যান্ট ৫। ক্যান্সার ৬। ল্যাবরেটরি এ্যাসিস্ট্যান্ট
- ৭। ল্যাবরেটরিয়াল ৮। টেলিফোন অপারেটর ৯। নার্স ১০। পাশ করা কন্সটাবল ১১। টেলিগ্রাফার
- অপারেটর ১২। কী-পা-ক অপারেটর ১৩। ট্রেণ্ড টিচার ১৪। ডাঃভার ১৫। কমপিউটার অপারেটর
- ১৬। অফিস মেশিন অপারেটর ১৭। ডিপ্লোমা হোল্ডার ইন টেকনিক্যাল ১৮। ড্রাফটসম্যান ১৯। স্টোর ক্লার্ক
- ২০। সমস্ত অনার্স গ্রাজুয়েট।

উপরিউক্ত ২০ প্রকার কর্মের জন্য উপযুক্ত তপসিলী জ্ঞাতি ও উপজাতি কর্মপ্রার্থী রাজ্যে সর্বত্র পাওয়া যাইতেছে না। সে কারণে তপসিলী জ্ঞাতি ও উপজাতি কল্যাণ বিভাগের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্ম নিয়োগ অধিকার হইতে রাজ্যের সংশ্লিষ্ট কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে উক্ত ২০ প্রকারের কর্ম প্রার্থীর নাম যে কোন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রেই নিবন্ধীকৃত থাকুক না কেন তাহাদের প্রত্যেকের নাম সন্টলেক নাম সন্টলেক বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে দ্বিতীয় বার নিবন্ধীভুক্ত হইবে এবং তদন্ত উক্ত প্রকারের তপসিলী জ্ঞাতি ও কর্ম প্রার্থীদের বিষয়ে “সেকেশারী ইন্ডেক্স কার্ড” সন্টলেকের বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে পাঠাইবারও নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

তপসিলী উপজাতিদের ক্ষেত্রে শুধু উক্ত প্রকারের কর্মপ্রার্থী ছাড়াও মাধ্যমিক বা মাধ্যমিকোত্তর যে কোন কর্ম প্রার্থীর “সেকেশারী ইন্ডেক্স কার্ড” সন্টলেকের বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে নিবন্ধীকৃত তপসিলী জ্ঞাতি উপজাতি কর্ম প্রার্থীগণ উপযুক্ত কেন্দ্রে তাহাদের নাম বিভিন্ন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে হইতে সন্টলেকের বিশেষ কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে পাঠানো হইয়াছে কিনা তাহা অনুসন্ধান করুন এবং উক্তরূপ নাম পাঠানো নিশ্চিত করুন।

ক্রমিক সংখ্যা ২৬/৮৮-৮৯ আই,এণ্ড,সি,এ, নদীয়া তাং ২৩/৯/৮৮

সাহিত্য সৈকত/অক্টো-ডিসেম্বর ৮৮ ট-৮৮

আমাদের শারদীয় অভিনন্দন

গ্রহণ করুন—

ফুলিয়া বাস স্ট্যাণ্ড থেকে ১ মিনিট আর রেল স্টেশন থেকে ৩ মিনিটের পথ। ৩৪ নং জাতীয় সড়কের পাশেই আমাদের উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র।

আমাদের নিজস্ব শিল্পীর হাতে তৈরী শাড়ীর গুণমান স্বতন্ত্র। ঐতিহ্যময় টাঙ্গাইল শাড়ির ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রতিষ্ঠান। প্রুজোয় বিপুল সম্ভার।

শাড়ী কুঠির

প্রোঃ বনৌ গোস্বামী দাস

ফুলিয়া বাসস্ট্যাণ্ড, চটকাতলা, বদীয়া।

ফোন-বাড়িঃ ফুলিয়া ৩৮

অফিসঃ ফুলিয়া ৩৯

আমাদের কলকাতা বিক্রয় বেঙ্গল—

বালিগঞ্জ কলকাতা-২৯

ফোন ৪২৮৩৮৭

শারদোৎসবে বাংলার তাঁতের কাপড়

এই উৎসবের

মরসুমে

কেনাকাটার

বিষয়ে একটু

অন্যরকম ডাবুন না !

বাংলার হস্তচালিত তাঁতের কাপড় আমাদের এক অমূল্য সম্পদ। রদে, বুননে, নকশায় অনঙ্গ। যন্ত্রের বৈয়াক্তিক উৎপাদন নয়, মানুষের সস্তায় ছোঁয়ায় উজ্জ্বল।

বৈচিত্র্যপূর্ণ সস্তার থেকে বেছে নিতে পারবেন নিজের পছন্দ সহি জিনিসটি। আছে বালুচরী, জামদানী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি ও অগাধ শাড়ির সমারোহ। তাছাড়া মর্যাদাপূর্ণ খদ্দেরের শাড়ি। আছে সালামার ও কুর্তার হরেক রকম কাপড় এবং পুরুষদের জুতা রুচিসম্মত পলিয়েস্টার ফুটিং ও শাটিং। আর রয়েছে বেডশিট, বেডকভার ও পর্দার কাপড়। ঘর সাজানোর জুতা পাবেন চর্ম, ধাতু ও মুংশিল্লের আশ্চর্য সুলভ নিদর্শন।

হস্ত শিল্পজাত সামগ্রী কেনবার সিদ্ধান্ত নেওয়া মানেই আপনি আপনার বিশিষ্ট রুচির পরিচয় দিতে চলেছেন। আর সেই সঙ্গে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন অগণিত শিল্পীদের দিকে, আপনার সিদ্ধান্ত তাকে স্বনির্ভরতার পথে আরো একটু এগিয়ে দেবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

With best.....

compliments.....

from.....

M/s. BIREN KR. BASAK

Specialist in Tangail Saree Daccai Jamdani etc.



☆



Chatkatalla, Fulia Boyra

Nadia. W. Bengal.

Phone : Nadia 32

অতিথি নিবাস

গৌর বৈরাগী

—একটু বাইরে এসে দাঁড়াও।

বাণীর কথায় কাগজ থেকে মুখ তুলল জহর। সামনে ভিজ়ে কাপড়ে বাণী দাঁড়িয়ে। জহরের বাইরে গিয়ে দাঁড়বার অপেক্ষায়। ভেতরে এসে কাপড় ছাড়বে।

কাগজ ছেড়ে উঠতে উঠতে জহর ভাবল, আচ্ছা ফ্যাসাদ। আবার সেই পুরনো অব্যাসটা ফিরিয়ে আনতে হয়। খুবই পুরনো ব্যাপার শুরু হয়েছিল সেই কবে।

ভিজ়ে শাড়িতে শরীর জড়িয়ে নব বধু। আধো আধো গলা। আধো আধো চাউনি। এক পা ঘরে। এক পা বাইরে—একটু বাইরে যাবে।

সবে ঝঞ্ঝরঘরে এসেছে বাণী। গলায় কচি কলাপাতার নজ্রতা। শরীরময় ফুলের সুবাস। শাখায় শাখায় রহস্য আর বিস্ময়। সেই বিস্ময়ের দিকে অবাক সবাক চেয়ে জহর বলেছিল কেন!

—অসভ্য কোথাকার। বলে বাণী রহস্য করেছিল—
চোখের তারায় বর্ণমালা। অপটু জহরেরও সে বর্ণমালা পড়ে দিতে অনুবিধে হয় নি।

ভিজ়ে শাড়ি বদল করবে বাড়ির বউ। ঘরে স্বামী থাকলে তাকেও এসময়টা বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হয়। এমনটাই নিয়ম। তো সেই নিয়মে তারপর থেকে বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়ল জহর। জহর ঘরে আছে, দেখল বাণী ভিজ়ে কাপড়ে ঢুকছে। কিছু বলতে হত না, জহর নিজেই বাইরে এসে দাঁড়াত। শুধু মাঝের কিছুদিন নিয়মটা বদলে গেছিল। কিংবা বলা যায় নিয়মটা মানার দরকার হয় নি।

আট বাই দশ বাথরুম। দেওয়ালে চার ফুট পর্যন্ত

মোজেক, বেসিন। বেসিনের ঠিক ওপরেই আয়না, পাশে হ্যাণ্ডার। কমপ্লিট হয়ে যেতে বাণী দেখেটেখে বলেছিল—এখানে যে ভাতের খালা নিয়ে বসা যায়।

জহরের কথা বার্তায় তখন কি কতৃহ। হাঁটাচলায় ফেটে পড়ছে ব্যক্তিহ। খসখস করে পে-ইন-স্লিপ লেখে আর থোক থোক ঢাকা তুলে আনে তেরোশো চব্বিশ নম্বর ব্যান্ড এ্যাকাউন্ট থেকে। বাইশ হাজার সেকেন্ড ক্লাস ব্রিকস্। দশ চন সিমেণ্ট। দেড় কুইন্টাল রড। ছশো ফুট স্টোন চিপস্। ডায়েরির পাতায় ডেট দিয়ে দিয়ে হিসেব।

জহর হাসতে হাসতে বলেছিল—অনেক দিনের একটা বড় সমস্যা তোমার মিটল।

বাথরুম দেখতে দেখতে বাণী অবাক! কিসের সমস্যা—
—কাপড় কাচার, কাপড় ছাড়ার, এবার আর ঘরবার করতে হবে না, জহর হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ডার দেখিয়েছিল। এখানে শুকনো শাড়ি জামা রাখবে। কেচেকুচে পরে নিয়ে একবারে ফিটফাট হয়ে বেরবে।

কাগজ ছেড়ে জহর বাইরে আসতেই ঠাণ্ডা হাওয়াটা জ্বল করে বয়ে গেল। হাওয়ায় যেন জ্বলো গন্ধ। মেঘ করেছে আকাশে। খুব গরম যাচ্ছে কদিন। বৃষ্টি হলেও হতে পারে। বর্ষা আসতে খুব একটা দেরি নেই। আজ বাজারে ইলিশ উঠেছিল। খানিকটা আনলে বৃষ্টির সঙ্গে মন্দ জমত না। বাণীকে তাহলে খিচুড়ির কথা বলা যেত। বৃষ্টির সঙ্গে খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা ‘আ’! এইটুকু পর্যন্ত ভাবনা এলাউ করা যায়। মাসের মাঝামাঝি, এর মধ্যেই পকেট এ্যানিমিক। আর বাই হোক পকেটের সঙ্গে অন্তত গাজোয়ারি করা ঠিক হবে না। তার চাইতে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাওয়া ভাল। বুর বুর করে বৃষ্টি পড়া দেখতে ভাল।

সব মিলিয়ে মিশিয়ে আবার যেন পেছন দিকেই ফিরে যাওয়া। বেশ মনে আছে, এরকম এরকম বৃষ্টির দিনে পুকুর

থেকে তুলে আনা টাটকা কলমি শাক ভাজার সঙ্গে একথালী ভাত। আমি খাব না।

—ছিঃ বাবা বলতে নেই অমন কথা। মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছে! আমরা যে গরীব। তুমি ভাল করে লেখাপড়া করো। বড় হও তারপর ভাল ভাল খাবে।

সেই জহরের লেখাপড়া হল। বড় হওয়া হল। চাকরী হল। এইচ.বি. এল তুলে বাড়ি হল। আজ বাজার থেকে চ্যাডস এনেছে জহর। আলু দিয়ে ঝাল বেশ হয়। সঙ্গে মুসুর ডাল। মন্দ লাগেনা। সটাসট ভাত ঢুকে যায় ভেতরে। শুধু যা ঘ্যান ঘ্যান করে ফেলুটা। বুঝতে শিখেছে একটু একটু ক্লাশ থিতে পড়ে। বলে, আমাদের বাড়িতে ওরা আসবে কেন!

ওরা মানে সুধেন্দু বাবুরা। ছোটো ট্রাকে সংসার বোঝাই হয়ে এসে দাঁড়িয়েছিল। খাট, আলমারি, ডেসিং টেবিল, আয়না, ফ্রিজ, টিভি, ফিলিপস স্টিরিও, গ্যাসের সিলিগ্যার। মানে ছোটো ট্রাকে বেডরুম, ড্রইং রুম, ডাইনিং রুম, কিচেন এসে হাজির। তিনটে কুলি। সুধেন্দু বাবু আর তাঁর ছেলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নির্দেশ দিচ্ছে আর কুলিরা মাল নামিয়ে ঘব সাজাচ্ছে। দেখতে দেখতে ফেলু বলে ফেলেছে বাবা আমাদের বাড়িতে ওরা আসবে কেন!

চমকে এক চটকা চারপাশ তাকিয়েছে জহর। সুধেন্দু বাবুদের কারো কানে গেলে যে ভারি লজ্জার। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে ফেলুকে নিয়ে ওপরে।

—ওরা ভাড়া নিল। মাসে মাসে একজন্মে আমাদের টাকা দেবে জানিস।

ফেলু চুপচাপ কথাটা শুনেছিল। পুট পুট করে তাকিয়েছিল। তারপর হঠাৎ ছম করে বলে উঠেছে—না!

শুনে জহরেরও মন আনচান। চোখের পাতায় ঘন ঘন ঝটানামা। ভেতরে ওরই মত যুক্তিযুক্তির ধার না ধারা

একব্যাটা ষাপটি মেরে বসে আছে। ছাতা মাথায় আধলা আর ভেলি এগিয়ে দিয়েছে রাম কিশোরকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অফিসের আর্নড লিভ গিয়ে ঠেকেছে তলানীতে। উপায় নেই, ব্যাটারা বড় ঝাঁকিবাজ। অপরের টাকায় দুখ দরজও নেই। আস্ত আস্ত ইঁট ছুম করে বাসুলিতে ছ' আধখানা। হাঁ হাঁ করে উঠেছে জ্বর, রাম কিশোর, একটু দেখেওনে ভেঙে বাবা। একটা ইঁট যে টাকা টাকা হয়ে গেল। ইঁট নয় যেন জ্বরকেই বাসুলিতে ছ' আধখানা করা।

তো একরকম তাই। হাড় মাস খুলে খুলে রামকিশোরের হাতে ভুলে দেওয়া, তার সঙ্গে তাল দিয়ে চলছে মন। লিনটন ঢালাই হবার দু'দিন আগে বলল—রাম কিশোর লবিটার ওপর ব্লিক্‌জ্যাক্ ঢালাই দিতে পারবে!
—সেটা কি বাবু।

কথায় বোঝাল। ভঙ্গিতে বোঝাল। শেষে খাতার ওপর ডটপেনে ছবি অঁকল জ্বর। ইসকুলের ড্রইং ক্লাশে শেষ ছবি অঁকার পর প্রায় পঁচিশ বছর বাদে ছবি অঁকল সে। তো সে ছবি রামকিশোর বুঝবে কেন। অথচ লবির ওপর ঐ ব্লিক্‌জ্যাক্ তার চাই। অগত্যা রামকিশোরকে ভারী থেকে নাবিয়ে সাইকেলের রডে বসিয়ে সাঁই সাঁই গঙ্গার ধার।

করাসীদের তৈরী গঙ্গার ধারে কলেজ, ইসকুল, গির্জা তার এধার ওধার কিছু কঁাকা জমি ছিল। আজ সেগুলো কাঁচা সোনা। তারই ওপর কটা সার সার নতুন বাড়ি। রামকিশোর ভারি অস্বাভ—এ যে অনেক ট্যাকার ব্যাপার বাবু।

হবেই বাড়ি তো নয় গঙ্গার ধারে ফুরফুরে হাওয়ার ভেতর এক একটা ছবি। তো পুরো ছবি কে চায়। আর চাইলেই বা পাচ্ছে কে! তার দরকার শুধু ছবির এক টুকরো রঙ।

জহর বলেছিল বাড়ি ভেঁ একবারই হবে। ইচ্ছে যখন
হয়েছে তখন লবিতে একটু জ্বিক্জ্বাক্ খেলুক।

বড় কষ্টে কেটেছে। দিনগুলো। রাতগুলো। আলো
নেই। বাতাস নেই। চাপা স্তমোটি। বাড়িগুলার রক্ত চক্ষু।
একদা এক গভীর রাতে নিঘুম বাণী আর জহর। বাইরে
চাঁদের আলো ছিল আকাশে। ফুরফুরে বাতাস ছিল।
সেইমাত্র ফেলুটাও ঘুমিয়েছে। চিকন নারকেল পাতায়
চাঁদের আলো লুকোচুরি খেলছে। ভুল করে কোকিলও ডেকে
ফেলেছে একটা। ঘুম আসছে না। হুজনে মুখোমুখি।
আর এরকম একটা মুহূর্তেই বাণীর বাহুমূল ছুঁয়ে সিদ্ধান্ত
নিয়ে ফেলল জহর।

সাড়ে সাতশো স্কয়ার ফুট। দুটো বেড রুম। ডাইনিং
স্পেস। আট-দুই কিচেন। সামনে লবি। লবির সামনে
রাস্তা। গ্রিলের ভেতর বেতের চেয়ারে গা এলিয়ে বসে চা
খেতে খেতে রাস্তার লোক দেখবে জহর। নিজের হাতে
লাগানো গোলাপ চারায় ফুল আসতে দেখবে। বেল ফুলের
গন্ধ নিতে নিতে—বিকাশবাবুর কি বাজার হয়ে গেল নাকি।
আমিও এই মাত্র আসছি। ওফ্, বাজার তো নয় আগুন।
আর তো মশাই পারা যায় না। বলেই গরম কাপের কানায়
ঠোট ঠেকিয়ে চুমুক।

গ্রিলের ভেতর থেকে বাইরে কথার টুকরো ছুঁড়ে
দেবার মজাই আলাদা। আবার সে গ্রিলে যদি লতিয়ে ওঠে
মানিপ্রান্ট। পাতা থাকে যদি কটা বেতের চেয়ার।
দেওয়ালে স্নো-সেম কালার। তাহলে তো কথাই নেই।

চড়বর করে শব্দ উঠল খোলা ছাদে। বড় বড় বৃষ্টির
দানা। দাপিয়ে নামবে বোঝা যাচ্ছে। আকাশ জুড়ে
মেঘটা ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছে। জহরের গায়ে মাথাতেও
কটা দানা পড়ল।

—কি হল। গলা তুলল জহর। তোমার হল।

—আঃ তুমি বড় ছড়োছড়ি করো। ভেতর থেকে গলার
খাঁজ টের পেল জহর।

—এদিকে বৃষ্টি আসছে যে।

—আমুক, হুঁচার কোঁটা বৃষ্টিতে এমন কিছু গলে যাবে
না তুমি।

তা বটে, ঘরে থেকেও এতদিন বৃষ্টিতে তো কম ভেজা
হয় নি। কল একদিকে। বাথরুম একদিকে। আর
অন্যদিকে ঘর, বর্ষা কালে উঠতে বসতে ভেজা। সবচেয়ে বাজে
ব্যাপার ছিল রাতে খাবার পর আঁচানো। খেয়ে দেরে
এক দৌড়ে কলতলা। সেখান থেকে মুখ ধুয়ে ফিরে এলে
আর একদফা কাপড় বদলানো।

বাথরুমে ফিটিংস-এর সঙ্গে চকচকে সাদা বেসিন নামতে
দেখে বাণী অবাক। এটা কি গো।

—বেসিন। জহরের মুখে একগাল হাসি। ডাইনিং
স্পেসেও একটা ট্যাপ থাকবে। নীচে বেসিন। খেয়ে দেরে
টেবিল ছেড়ে উঠেই বাঁ দিকে বেসিন। কল খুলে মুখ ধোও
না কেন।

যত দেখছে তত অবাক বাণী। এতসব আরামের, সুখ
আচ্ছন্দের ব্যাপার স্থাপার ছিল। বাথরুমে খাঁজরি কল।
ডাইনিং রুমে বেসিন। কনসিল্ড ওয়ারিং। পিয়ানো বেল।
রান্নাঘরের দেওয়ালে বাণীর বুক সমান চায়না ক্রে টাইলসের
ফিটিং।

সব দেখে টেখে বাণী বলেছিল—নাঃ আমার আর
আফশোস হচ্ছে না।

ব্যাপারটা বোঝে নি জহর। গৃহ প্রবেশ হয়ে গেছে।
চারদিকে ভূমভূম করছে রঙের গন্ধ। টাটকা সজীব গন্ধ মেখে
খাওয়া শোয়া বসা। কথাবার্তার বারবারই যে গন্ধকেন্দ্রীক
হবে সে তো জানা কথাই, তবু ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে
নি জহর। কিছু আফশোস রাখবে না বলেই তো আয়োজন।
তবু ছিল কিছু। কিন্তু কি সেটা। বাণীর দিকে তাকিয়েছিল জহর।

—তোমাকে আজ বলছি। বাণীর চোখের তাঁরায় নরম ভাললাগা। যেদিন পুঁটলিতে ওগুলো বেঁধে পরেশের দোকানে নিরে গেছলুম চোখ ফেটে জল আসছিল আমার।

ধাঁ করে কথাটা মনে পড়ে গেছল জহরের। মণ্ডল জয়েলার্স-এ যাওয়া হয়েছিল বটে। পুঁটলির ভেতর বাণীর সর্বস্ব। নিশ্চিতে চেপে ওজন দিয়েছিল সাতভরি চার আনা।

নতুন গন্ধুলা ঘরে শুয়ে ঘুম আসছিল না। খাটের একধারে ফেলু। পাশে বাণী। বাণীর একটা হাত জহরের বুকে। সেই হাতে আলতো চাপ দিয়ে কিসকিস করেছিল জহর—কষ্ট কি আমারও হয় নি সেদিন। কিন্তু কিছু তো করার ছিল না।

এইচ. বি. এল. শেষ। নন রিফানডেবল, পি. এফ. এর পনের হাজার শেষ। দশ হাজারের একটা ক্যাশ সার্টিফিকেট ছিল। প্রি-ম্যাচিওর অবস্থায় তুলে আনতে হল। বাণীর সাতভরি গেল জুয়েলারিতে। বড় চিন্তা ভাবনা করে এখন রাস্তা বাছতে হয়। পীরতলায় শৈলেনের গ্রীল ফ্যাক্টরী। বাজারে নিমাইয়ের হার্ডওয়ার। বকুল তলায় ফার্নিচার হাউস। ভুল করে ঐ রাস্তাগুলোতে ঢুকে পড়লে তাড়াতাড়ি পালিয়ে আসে। তাড়াতাড়ি কাজ মিটিয়ে ঘরে ফেরে। দরজায় এপারে। চার দেওয়ালের ভেতর। মনে হয় এবার বুঝি নিশ্চিন্তি। কিন্তু না কলিং বেল বেজে ওঠে টুংটাং। কে!

—জহরবাবু, আমি নিমাই।

বাণীকে বলা কওয়া আছে। সব শেখানো পড়ানো। দরজা খুলে হাসি হাসি মুখে—ও আপনি, কিন্তু ও তো বাড়ি নেই।

নিমাই ফিরে যায়। হুয়ত পরেই আসে শৈলেন। পুরো বাড়ির গ্রিল ওর। এখনও ফিপটি পারসেট পেমেণ্ট বাকি। বাণী হাসি হাসি গলায় মুখস্থ বলে—সামনের মাগে ও দিয়ে আসবে।

এভাবেই ফিরে যায় নিমাই, ফার্নিচার হাউস কি শৈলেন।

কিন্তু করেননা একজন। দরজা খুলে ডাঃ চ্যাটার্জীকে ভেতরে
ভাঁকে বাণী।

ভাত টাত খেয়ে বেরুতে যাবে সেই সময় মাথাঘুরে
বসে পড়ল জ্বর। তারপর ধরাধরি করে বিছানায়।

ডাঃ চ্যাটার্জী কল বার করে বুক দেখলেন। প্রেসার
মাপলেন। তারপর অল্প হাসি হাসি মুখে তাকালেন—কি
ব্যাপার, কিসের এত চিন্তা। একটু খেতেটেতে হবে যে।
প্রেসারটা লো-হয়ে গেছে।

হড়বড় করে বৃষ্টিটা নেমে এল। আশ্চর্য এখনও কি
করছে বাণী। ও কি টের পায় নি। অবশ্য পাবার কথা নয়।
ভেতরে ফেলুটা বই খুলে চিৎকার করছে। আর খরে তো
জানলা বলতে ঐ মাত্র একটি। ওটা দিয়ে আর বাইরের
কতটুকু দেখা যায়। যাগগে মরুকগে, আর ডাকাডাকি
করবে না জ্বর। ভিজতে খুব একটা খারাপ লাগে না
ঐ তো বেশ লাগছে। চুড়চুড় করে বৃষ্টির জল গায়ে মাথায়।

শুধে ন্দু বাবুরা বেশ আছে না। এক ছাদের নীচে
শুরো পৃথিবীটা। গায়ে জল লাগবে না। রোদ্দুর লাগবে
না। হয়ত ডাইনিং টেবিলে বসে এখন জল খাবার খাচ্ছে।
কিংবা লবিতে বসে দেখছে বড় বড় বৃষ্টির ঝোঁটা। দেখবেই
কাদের দেখার জন্তেই তো সেই রাতে সিদ্ধান্ত।

বাণী বলেছিল—কি করা যায়।

জ্বর বলেছিল—আমিও ভাবছি।

ভাবতে ভাবতে রাত গভীর। চাঁদ ডুবে গেছিল
পশ্চিমে। একসময় সিদ্ধান্তটা জানিয়েছিল জ্বর। বাণী
একটুও দোনা মোনা করে নি—তাই দেখো, এভাবে তো আর—
তারপর শুধে ন্দু বাবুরা এলেন। বাড়ি দেখে দারুণ
পছন্দ। ঠিক এরকমটাই চাইছিলুম জানেন।

রাজি হবার আগে কথাটা বলেছিল জ্বর আশে

মুখে চাপা গলায়। ভয়ে ভয়ে—এ্যাডভান্সের পনের
হাজার মাস খানেক আগে দিতে হবে।

এক মাস আগে কেন? শুধে নুবাবু একটু অবাক
হয়েছিলেন।

—ওপরে আমাদের জন্তে একটুখানি মাথা গৌজার...।
কথা শেষ না করে মুহু হেসেছিল জহর।

রামকিশোর বলেছে হয়েছে যাবে। ছাদে ভিত লাগে
না। দশ ইঞ্চি পিলারে পাঁচ ইঞ্চির গাঁথনি। ওপরে
এ্যাসবেসটস দিলে পারেন। না হলে টালি। সিঁড়ির
নীচের ফালিটায় বাথরুম-পাইখানা। পনের বিশ হাজারে
হয়ে যাবে।

ঘটাং শব্দে দরজা খুলল বাণী। খুলেই—ওমা ভূমি
ভিজ্ঞে গেলে। এস এস।

জহর এল না। বৃষ্টির ভেতর দাঁড়িয়ে এক টুকরো
হাসল। ভিজিই না একটু। আবার এরকমই তো শুরু
হবে। মাস কয়েকের অতিথি নিবালে থাকার অব্যেসটা
বদলে কেলি না হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

১৮৬৩ থেকে ১৯০২—পূর্ণ চল্লিশ বছরও নয় । এই স্বল্প
আয়ুষ্কালের মধ্যে কলকাতার সিমুলিয়া দস্ত-বাড়ির বিশ্বনাথ
দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথ তাঁর শৈশব, বাল্য কৈশোর উত্তীর্ণ
হয়ে কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত এবং প্রাচ্য-
পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়নে আগ্রহী—সাহিত্যে ও সংস্কৃত
ভাষায় বিশেষ অনুরাগী অবস্থাতেই এখন যা স্কটিশচার্চ
কলেজ সেই বিদ্যায়তন থেকে বি. এ. পাশ করেন ।

১৮৭৯-তে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৮৮০-তে তিনি
প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন । সে-কলেজে দ্বিতীয় বর্ষের
ছাত্র যখন, তখন কিছুদিন খুব ম্যালেরিয়ায় ভোগেন তিনি ।
স্বাস্থ্যদ্বারের জন্তে কিছুদিন গয়া-তে যান । কলেজে তাঁর
উপস্থিতি কম থাকার ফলে এফ্.-এ পরীক্ষায় বসবার অনুমতি
পেতে বাধা ঘটে । অতঃপর চলে যান জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ
ইনস্টিটিউশনে—অর্থাৎ এখনকার স্কটিশচার্চ কলেজে । ১৮৮৩-
তে বি. এ. পাশ করে ১৮৮৪-তে তিনি মেট্রোপলিটন
ইনস্টিটিউশনের আইন-বিভাগে ভর্তি হন পৈতৃক বৃত্তিতে যোগ
দেবার ইচ্ছাতেই বোধহয় । ইতিমধ্যে অকস্মাৎ ঘটে যায়
পিতৃ বিয়োগ ।

তার আগেই বি. এ. পড়ার সময়ে কলকাতায়
নরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে দক্ষিণেশ্বরের প্রবাদ পুরুষ
রামকৃষ্ণ পরমহংসকে তিনি প্রথম দেখেন । আরো পরে
১৮৮২-র ৫ই-৬ই মার্চ দক্ষিণেশ্বরে গুরুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের
বিবরণ সুপরিচিত । ১৮৮২ থেকে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর
তারিখ ১৬ই আগষ্ট, ১৮৮৬-এই সময়ের মধ্যে রামকৃষ্ণের
অন্তরঙ্গতম প্রিয় শিষ্য হয়ে ওঠেন তিনি । রামকৃষ্ণদেবের
শেষ চিকিৎসার পর্বে প্রথমে কলকাতায় শ্রামপুকুরে,—পরে

কাশীপুরের বাগানবাড়িতে রামকৃষ্ণ যখন খুবই অসুস্থ, সেই কাশীপুর থেকেই ভবিষ্যৎ রামকৃষ্ণ-সংঘের সেবাব্রতের ভাবাদর্শ রূপ নিতে থাকে। প্রথমে মঠ গড়ে ওঠে বরান-গরের এক ভাঙা বাড়িতে—বছর-ছয়েক পরে সেখান থেকে যায় আলমবাজারে,—তারপর শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে ১৮৯৩-এ বক্তৃতা দিয়ে, স্বামী বিবেকানন্দ যখন জগদ্বিখ্যাত হয়ে,...

১৮৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর প্রথম সংযোগও, ১৮৯৬-এ অধ্যাপক ম্যাক্সমুলারের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে নানা দেশ ঘুরে তিনি ১৮৯৭ এ দেশে ফেরবার পরে,—১৮৯৮-এ গড়ে ওঠে বেলুড় মঠ। ব্যক্তিগত সাধনা এবং সংঘ-প্রতিষ্ঠা—তাই-ই ছিল তাঁর লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত। ঈশ্বর সন্ধান আর দেশপ্রেম তাঁর জীবনে এক হয়ে গিয়েছিল।

১৮৯৭-এ আমেরিকা থেকে ফেরবার পরেই তিনি তাঁর সহযোগী ও ভক্তদের এক সভায় বলেছিলেন—“নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, যে, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।” একথা লিখে গেছেন তাঁর শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। এই ডিসেম্বর ১৮৯৮ সকালে বেলুড়ে তখনকার ভাড়াটিয়া মঠে গঙ্গান্নান করে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাছকায় অঞ্জলী দিয়ে তিনি ধ্যানস্থ হন। তারপর দক্ষিণ স্বর্গে রামকৃষ্ণের চিত্তাভ্যাসের কৌটো নিয়ে, বেলুড়ের তখনকার ভাড়াবাড়ি থেকে যথোচিত সমারোহে মঠের নতুন ভূমিতে যাওয়া হয়। এই নতুন ভূমি হোলো নীলাস্বরবাবুর বাগান—অর্থাৎ উত্তরকালে যেখানে গড়ে উঠেছে এখনকার বিশাল মঠ-মন্দির।

স্বামীজী বলেন — এই মঠ থেকেই ভবিষ্যতে **Practical-Religion** ছড়িয়ে পড়বে। শংকরাচার্যের ঐতি শিষ্য সাহিত্য সৈকত/ অক্টো-ডিসেম্বর '৮৮

শরৎচন্দ্রের খুব ভক্তি ছিল। সেদিন স্বামীজী তাঁকে বলেন—
 “শংকরের ক্ষুরধার বুদ্ধি— তিনি বিচারক বটে, পণ্ডিত বটে,
 কিন্তু তাঁর উদারতাটা বড় গভীর ছিল না, হৃদয়টাও ঐরূপ
 ছিল বলে বোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণ-অভিমানটুকু খুব ছিল।
 ব্রাহ্মণেরও জ্ঞাতের ব্রহ্মজ্ঞান হবে না, এ কথা বেদান্তভাবে
 কেমন সমর্থন করে গেছেন। বলিহারি বিচার।”

গৌতম বুদ্ধের প্র্যাকটিক্যাল জীবকল্যাণের ধর্মের তিমি
 সেদিনও খুব প্রশংসা করেন। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে হৃদয়ের
 উদারতার ওপর বিশেষ জোর দেন তিনি। আবার রামানুজ
 ও চৈতন্য মহাপ্রভুর কথাও বলেন। কোনোরকম সংকীর্ণতা
 বা সাম্প্রদায়িকতাতে তাঁর আস্থা বা প্রজ্ঞা ছিল না। শক্তি,
 শিক্ষা, সারল্য, সত্যতা— এই সবই ছিল তাঁর ধর্মচর্চা।

মঠের তিন শাখা হবে— এই ছিল তাঁর স্বপ্ন।—
 “প্রথমে অন্নদান, তারপর বিদ্যাদান, সর্বোপরি জ্ঞানদান।
 “সেই ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দেই শিষ্য শরৎচন্দ্র-কে তিনি বলেন—
 জীবজগতের সর্বত্র তোর নিজ সত্তা দেখে অবাক হয়ে পড়বি।
 তখন সকলকে আপনার মতো যত্ন না করে থাকতে পারবি
 না। এরূপ অবস্থাই হচ্ছে Practical Vedanta। সকলের
 সেবার জন্যে স্বার্থবোধহীন পূর্ণ আত্মোৎসর্গের নামই
 স্বামীজীর দীক্ষামন্ত্র।

সুরেন্দ্রনাথ সেন স্বামীজী সম্বন্ধে তাঁর ‘তিন দিনের
 স্মৃতিলিপি’তে ২২-এ জানুয়ারি ১৮৯৮ সালে ৫৭ নম্বর
 রামকান্ত বসু স্ট্রিটে প্রসিদ্ধ বলরাম বসুর বাড়িতে একঘর
 লোকের মধ্যে বিবেকানন্দের এই উক্তি উল্লেখ করেন যে,
 আমরা যে নিজেদের ওপর প্রজ্ঞাহীন, বিশ্বাসহীন হয়ে
 পড়েছি তার অন্তিমত কারণ হোল আমাদের উপযুক্ত শিক্ষার
 অভাব। —“দেশে এই প্রকার ভাবটা আবার আনতে

হবে। নিজের উপর বিশ্বাসটা আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। “কথায় কথায় সেই বাড়িতেই তিনি বলেন—‘দেশ-কাল-নিমিত্তের নামই মায়া। আবার সামাজিক প্রসঙ্গে ভীত ভাষায় বাস্তববাহের নিম্নে করেন তিনি। একই আসরে শ্রীচৈতন্যদেবের কাম-কাঙ্ক্ষন ত্যাগের জলন্ত আদর্শের কথা বলেন। এইরকম আরো অনেক কথা পাওয়া যায় তাঁর সেই পর্বের অনুরাগী হরিপদ মিত্র প্রভৃতির লেখা থেকেও।

সেই পর্বেরই স্বামীজী বলেছিলেন — “নিজের নিজের কর্ম অনুসারে প্রবৃত্তি হয়, সবই নিজের কর্মকৃত, সেই জন্যই প্রবৃত্তি দমন বা তাকে সুচারুরূপে চালনা করাও সম্পূর্ণ নিজের হাতে।” আবার শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর কথা—প্রসঙ্গেই তিনি বলেন— “জ্ঞানমিশ্র ভক্তির সঙ্গে ভগবানকে ডাকবে। ভক্তির সঙ্গে বিচার বুদ্ধি রাখবে।” বলেছিলেন— “বিচার-বুদ্ধি না থাকলেই সর্বনাশ। ‘চৈতন্যদেবের, গৌতম বুদ্ধের, খ্রিষ্টেরও জন্মবস্তার ব্রত ছিল স্বামীজীরও ব্রত। ‘নিষ্কাম কল্যাণ কামনা বললে তাঁর মনের প্রকৃতি কতকটা বোঝা যায়। আরো অনেক বিশেষণ যোগ করাও অস্ফায় নয় কারণ তাঁর মনে ছিল আকাশের ব্যাপ্তি এবং সিংহের বিক্রম।

ইংলণ্ড থেকে দেশে আসবার পথে ভূমধ্যসাগরে জাহাজে ঘুমিয়ে পড়ে এক স্বপ্ন দেখেন তিনি — বড়ো থুঁড়থুঁড়ো ঋষিভাবাপন্ন একজন লোক আমাদের বলছে, তোমরা এস, আমাদের পুণরুদ্ধার কর, আমরা হচ্ছি সেই পুরাতন খেরাপুও সম্প্রদায় — ভারতের ঋষিদের ভাব নিয়েই যা গঠিত হয়েছে। খ্রিষ্টানেরা আমাদের প্রচারিত ভাব ও সত্যসমূহই যীশুর দ্বারা প্রচারিত বলে প্রকাশ করেছে। নতুবা যীশু নামে বাস্তবিক কোন ব্যক্তি- ছিল না।

সেই জায়গাটা ছিল টার্কির কাছাকাছি। প্রয়োজনীয় প্রস্তুত সন্ধানের জন্যই সেই বুদ্ধ সেখানে খননের প্রস্তাব করেন। যুম ভাঙতেই কাপ্তানকে জিগেস করে স্বামীজী জানতে পারেন— 'ওই সামনে টার্কি এবং ক্রীটদ্বীপ দেখা যাচ্ছে। স্বপ্নটি অদ্বুত বটে। জাগরণে ও স্বপ্নে এই ছিল তাঁর চরিত্র'। ভারতবর্ষের বেদ-উপনিষদ-গীতা, ভারতের মহামিলনের সাধনা—সেই সঙ্গে নবযুগের যথার্থ প্রগতিবোধের উদ্দীপনধন্য ছিলেন তিনি।

অর্থাৎ ব্যবহারিক অর্থেই ভেদবিচারহীন বিশ্বকল্যাণ সাধনই ছিল তাঁর ব্রত ও উপদেশ।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬/এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা—১০

ডব্লু বি এস আই সি ক্ষুদ্রশিল্পকে সাহায্য করে
আর ক্ষুদ্রশিল্পগুলি সাহায্য করে সমগ্র দেশকে।

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তনশিল্পের সংগ্রহ ও
বিকাশের ক্ষেত্রে নানানভাবে সাহায্য করে থাকে। ১) ছুতাপা-
কাঁচামাল সংগ্রহ ও এস এস আই ইউনিট গুলিকে বিতরণ
২) আন্ত কাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা ৩) এস এস আই
ইউনিটগুলিকে বিপণনের ব্যবস্থা ৪) আই আর বি আই
এর প্রকল্প অনুসরণে রপ্তা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলিকে
আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ
উদ্যোগে শিল্প প্রকল্প গঠন।

এভাবেই রাজ্যের শিল্পউন্নয়ন, আর্থিক অগ্রগতি এবং কর্ম-
সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই সংস্থা এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ
ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য
যোগাযোগঃ—

জনসংযোগ আধিকারিক

ফোন নং ২৭-৩০৬-০৭

রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদানে ছাত্রদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের প্রভাব— দুটি মূল্যবান সাক্ষাৎকার

[রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের মধ্যে মানুষ গড়ার কাজ—অর্থাৎ শিক্ষাদানের কাজই হচ্ছে প্রধান। এ বিশ্বাস আজ সকলের মনে যে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ রাজ্যে অস্বাভাবিক সরকারী বেসরকারী ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রামকৃষ্ণ মিশনের অবদান প্রশংসনীয় এবং যথেষ্ট উল্লেখনীয়।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠান সমূহ পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শের ধারক। “মিশনের শিক্ষাদানে ছাত্রদের উপর স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শের প্রভাব কতটুকু লক্ষ্য করা যাচ্ছে”—এই বিষয়ের ওপর একটি সাক্ষাৎকার চেয়েছিলাম আমরা রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়া’র সেক্রেটারী সন্ন্যাসী মহারাজ রমানন্দজী ও পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ এর সেক্রেটারী স্বামী উমানন্দ মহারাজের কাছে। সাক্ষাৎকারের নির্দিষ্ট দিনে রমানন্দ মহারাজ একটি বিশেষ কাজে অস্বস্তি চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে বয়েজ হোমের প্রধান শিক্ষক স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজ সাক্ষাৎকারটি দেন। স্বামী জ্ঞানানন্দ মহারাজজী আগ্রহ ভরে সাক্ষাৎকার দিয়ে আমাদের অনুগৃহীত করেছেন। অনুগৃহীত করেছেন স্বামী উমানন্দ মহারাজও।

রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোমটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৩৭ জন ছেলে নিয়ে। পুরুলিয়ার বিদ্যাপীঠটি আরো পরে ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে। “মানুষ তৈরী এবং চরিত্র গঠনই” ছ’টি প্রতিষ্ঠানের আদর্শ। পরীক্ষার ফলাফলের দিক থেকে ছ’টি প্রতিষ্ঠানের ফলাফলই ভাল।] —সম্পাদক

আমার মধ্যে যে আমিও আছে যে ব্রহ্মও আছে সেইটি হচ্ছে বিবেকানন্দ

—স্বামী জয়ানন্দ

প্রশ্নটি খুবই প্রাসঙ্গিক। আমাদের দিক থেকে বলতে গেলে একটা কথাই বলতে হয় যে, ছাত্রদের যে শিক্ষা আমরা দিই—পাঠ্য পুস্তকের বাইরে নির্দিষ্ট যে শিক্ষাটুকু দেওয়া আমরা প্রয়োজন মনে করি তা সেটি আমাদের নিজস্ব কোন চিন্তাধারা বা শিক্ষাদর্শ নয়। সবই স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শ এবং চিন্তাধারা, যেটি হচ্ছে আমাদের নিজেরদের জীবনের তো বটেই ছাত্রদের জীবনের পক্ষেও অত্যন্ত অপরিহার্য বলে আমরা মনে করি।

আমরা দেখছি যে ছাত্ররা, তারা শুধু আদর্শের কথা শুনেই তৃপ্ত থাকতে চায়না, শুধুমাত্র আদর্শের কথা বললে পরে তাদের মনের কাছে পৌছনো যায়না। যদি না সেরকম জীবন তাদের সামনে উপস্থাপিত করা না যায়। —স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী নিঃসন্দেহে আদর্শ জীবন ও আদর্শ বাণী। এই বাণীকে রূপ দিতে গিয়ে সমস্তা যেটি সবচেয়ে বড় করে দেখা যায় সেটি হচ্ছে স্বামীজীর আদর্শ রূপে রূপায়িত জীবন ছাত্রদের সামনে তুলে ধরা। সেটি আরো বেশি করতে পারলে আরো বেশি সাফল্য লাভ করা যেতো। তবু আমরা যারা এখানে আছি, আমরা যারা সন্ন্যাসীরা আছি, শিক্ষকরা আছেন, শিক্ষাকর্মীরা আছেন, ছাত্র যারা আছে এবং তাদের অভিভাবক-অভিভাবিকা যারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন- আমরা সকলেই এটা ধরে নিয়েছি—স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের কথা, বামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শের কথা যা বলে গিয়েছেন সেটা আমরা যাতে রূপ দিতে পারি, ছাত্রদের সামনে তুলে

ধরতে পারি সেই প্রচেষ্টাই হচ্ছে বড় এবং তাই আমরা করে থাকি। আদর্শটি হচ্ছে—‘আত্মা মোক্ষাঙ্ক জগৎ ধিতায়’— অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও জগতের কল্যাণ এই দুই-ই।

স্বামী বিবেকানন্দ আজ আর কোন ব্যক্তি-বিশেষ নন তিনি হচ্ছেন একটি ‘মত’ একটি আদর্শের রূপ। যেমন আমরা ছাত্রদের বলে থাকি স্বামী বিবেকানন্দ আজকে তোমার কাছে প্রশ্ন স্বামী বিবেকানন্দ আজকে তোমার কাছে সমাধান স্বামী বিবেকানন্দ আজকে তোমার কাছে আত্মবিশ্বাস আত্মজিজ্ঞাসা এবং সর্বোপরি আমার মধ্যে যে আমিহ আছে যে ব্রহ্মহ আছে সেইটি হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ। এই যে কথাটি বললাম যে স্বামীজী যেটি সবচেয়ে বড় কথা, স্বামীজী বলে গেছেন ‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর’—যেটি আমরা দেখছি ছাত্রদের কাছে সবচেয়ে বেশী appeal করে সাধারণ মানুষের কাছে তো করেই শিশু মনের কাছেও সবচেয়ে বেশী appeal করে। আমরা তাদের ঘটনা দিয়ে বলার চেষ্টা করি উদ্ভুদ্ধ করার চেষ্টা করি। তাদের আগ্রহ সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

একটি ঘটনার উল্লেখ করছি আমি। ছেলেদের আমি বলি তাদের কাছ থেকে ঠিক যখন সেবামূলক কাজের সুযোগ এসেছে খুব ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি ছাত্রদের কাছ থেকে আমি।

ঘটনাটি হচ্ছে ১৯০১ সালে, স্বামী বিবেকানন্দের নাম যখন সমস্ত ভারতবর্ষে তোলপাড়, তখন কাশীতে তিনজন যুবক, একজনের নাম কেদারনাথ একজন চারুচন্দ্র ও যামিনীরঞ্জন এঁরা তিনজনই মেটি-কুলেশন পাশ করেছে তখন। এফ, এ, পড়ছে কেউ বা পরীক্ষা দিয়েছে, এরা তিনজনই স্বামীজীর কথা শুনেছে কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় তখনও তাদের হয়নি। এঁরা তিনজন

ধার্মিক যুবক। নিত্য গঙ্গাস্নান করে। বিশ্বনাথ দর্শন করে এবং কেশবদেবের বাড়িতে সঙ্ঘ্যাবেলায় মিলিত হয়ে জপ ধ্যান ইত্যাদি শাস্ত্র পাঠ করে। এই সময় ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। প্রথম সংখ্যা বেরিয়ে গেছে। দ্বিতীয় সংখ্যাটি সেইদিন বিকেল বেলা ডাকে যামিনী রঞ্জনের হাতে গিয়ে পৌঁছেছে। সেই ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ একটি কবিতা লিখেছেন। কবিতাটির নাম হচ্ছে—সঙ্ঘ্যার কবি। সেই কবিতাটি পড়ে বিকেল বেলায় যামিনীরঞ্জন পাগলের মত ছুটতে ছুটতে কেশবদেবের বাড়িতে গেলেন। তখন সঙ্ঘ্যা হয়েছে কেশবদেব তার ঘরে বসে জপ করছেন। যামিনী রঞ্জন চীৎকার করে বলছেন—কি তুমি জপ করছ এই দেখ কি বেরিয়েছে, এই বইয়ে। দেখলো, স্বামীজী লিখেছেন—‘ব্রহ্ম হতে কীট পরমাণু সর্বত্রই সেই প্রেমময়/বহুরূপে সন্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর/জীব প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।’

এই তিন বন্ধু সঙ্ঘ্যা বেলায় সেখানে মিলিত হয়ে এটি পড়ে এতই অনুপ্রাণিত হলো যে দশাশ্ব মেঘের ঘাটে এসে তারা তখন পায়চারি করছে, পায়চারি করতে করতে বরতে দেখে রাস্তার ধারে একটি বিধবা মহিলা মলমূত্র মাখা অবস্থায় পড়ে আছে। কলেরা রোগে আক্রান্ত। তাকে দেখেই তারা বলে উঠলো—‘এই তো আমাদের সমস্যাসের আদর্শ।’

তখন তাঁরা তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সেবা শুশ্রূষা করে তিন দিন বাদে সুস্থ করে তুললো। এই যে স্বামীজীর বাণী এই যে সেদিনের ঘটনা এটিকে কেন্দ্র করে আজ কাশীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ‘কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাজ্ঞান’। তাই দেখা যাচ্ছে যে সামান্য একটু আদর্শ আর ‘উদ্বোধন’ যদি একটু উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পারে, সঠিক ভাবে যদি তাকে

পরিচালনা করা যায় তাহলে ফলে ফুলে রূপদান করতে পারে। আমরা দেখছি আমরা এখানে যখন কোন রিলিফ করি সাফাইয়ের কাজ করি সেবা, যজ্ঞে এগিয়ে যাই, ছাত্ররা এগিয়ে আসে। আমরা ছাত্রদের বলি তুমি যে একজনের হাতে একটা জিনিস তুলে দিচ্ছ তা'ত অস্ত্রের দেওয়া জিনিস অস্ত্রে টাকা দিয়েছে, পয়সা দিয়েছে। তা দিয়ে কেনা জিনিস একজনকে দিচ্ছে কিন্তু তুমি কি দিচ্ছ? তুমি দেবে সেবার সঙ্গে তোমার শ্রদ্ধা। স্বামীজী বলেছেন সেবা বললেও আমার মনোভাবটা ঠিক বুঝায় না সেবা নয় পূজা। এই ভাবটা আমরা ঘটনার উল্লেখ করে করে ছাত্রদের মধ্যে স্বামীজীর আদর্শের কথা বোঝাবার চেষ্টা করি। দ্বিতীয় হচ্ছে আমরা ছাত্রদের বলি দেশ প্রেম এটা হচ্ছে সব চেয়ে বড় জিনিস। ছাত্রদের আমরা বলি দেশপ্রেম। যদি না থাকে একটা নৌকো বা জাহাজ তার যদি হাল না থাকে সে যেমন সঠিক ভাবে যেতে পারে না দেশপ্রেম না থাকলে তোমার জীবনটাও সেরকম চলবেনা।

স্বামীজী নিজের চাইতেন যে আদেশ মানার ক্ষেত্রে তুমি যাকে সর্দার বলে মেনে নিয়েছো তাকে তুমি দৃঢ় চিত্তে যে কোন পরিস্থিতিতে নির্ভিক হ্রদয়ে তাঁর আদেশ মানার জগু প্রস্তুত থাকবে। অনেক উদাহরণের একটি উদাহরণ আমরা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরি তা হল স্বামীজীর একজন শিষ্য-স্বামী নিশ্চয়ানন্দ। সে মারাঠী যুবক ছিল, সে সাধু হয়েছিল। স্বামীজীর শিষ্য হয়েছেন। বেলুড় মঠে তখন তিনি আছেন স্বামীজী আছেন বেলুড় মঠের তখন আর্থিক অবস্থা খারাপ, একজন ভক্ত একটা গরু দান করবেন একটু দুধ পাওয়া যাবে ঠাকুরের ভোগে। আড়িয়াদহ থেকে গরুটি আনতে হবে। স্বামীজী নিশ্চয়ানন্দ ও আর একজন শিষ্য নির্ভয়ানন্দকে বললেন তোমরা গিয়ে নৌকো করে গরুটি নিয়ে এসো এবং নিশ্চয়ানন্দকে বিশেষ ভাবে স্বামীজী বললেন তুমি গরুর দড়িটি হাতে ধরে থাকবে কারণ নৌকো অনেক সময় স্রোতে, ঢেউয়ে ছলবে

গরু ভয় পেতে পারে লাফিয়ে পড়তে পারে জলে, তাই দড়িটি তুমি হাতে ধরে রাখবে। তারা হু'জনে গিয়েছে। গরু এনেছে গরুটিকে নিয়ে নৌকো ভাড়া করে ফিরছে। গঙ্গায় ঢেউয়ে নৌকো তুলতে লাগলো। গরু ভীষণ ভয় পেয়েগেলো। নৌকো থেকে ঝাঁপ দিয়েছে গরুটি নিশ্চয়নাম্পের হাতে ছিল গরুর দড়ি সবাই চিংকার করে উঠেছে দড়ি ছেড়ে দাও কে কার কথা শুনে। নিশ্চয়নাম্পও গরুর দড়ির টানে গঙ্গায় পড়লো। মুহূর্তের মধ্যে নিশ্চয়নাম্প ও গরু ভেসে চলে গেল গঙ্গায়। খালি নৌকো মঠে ফিরে এসেছে। মঠে সবাই উদ্বিগ্ন। স্বামীজী অত্যন্ত অস্থির হয়ে ওঠেছেন। প্রায় ছ'মাইল এসে যাওয়ার পর নিশ্চয়নাম্প, সে ভাল সাঁতার জানতো জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে গরুটিকে পারে নিয়ে এসেছে। —সে ভাল সাঁতার জানতো এবং লোকজনের সাহায্যে আবার একটি নৌকো করে যখন গরুটিকে নিয়ে মঠে পৌঁচেছে তখন সন্ধ্যা হয় হয়।

স্বামীজী তাকে তিরস্কার করে বললেন—তুমি মুখের মত গরুর দড়ি ধরে ঝাঁপ দিয়েছিলি কেন? নিশ্চয়নাম্প বললেন—আপনি আমাকে বলেছিলেন গরুর দড়ি ধরে থাকতে, আমি দড়ি ছেড়ে দেবো কি করে সম্ভব? স্বামীজী অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেছিলেন—ই্যা সেটা তোমার পক্ষে সম্ভব নয় আমি তোমাকে গরুর দড়ি ধরে থাকতে বলেছি তা তুমি কেন সেটা ছেড়ে দেবে।

ঐরকম ভাবে আমরা দেখি শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দর যে আদর্শ, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ একজন আর এক জনকে বাদ দিয়ে কোন কথা কিছু বলা যায়না—সেই আদর্শে ছাত্ররা এখানে অনুপ্রাণিত হচ্ছে আমাদের হোমে যে সমস্ত ছাত্ররা আসে ৩/৪ বছর ৫ বছর বয়সে তাদের অনেকের মধ্যে এমন কিছু সংস্কার থাকে, যে সংস্কারের প্রভাবে তারা অন্য জায়গায় থাকলে তাদের জীবন হয়তো হারিবার হয়ে যেতো আমরা তাদেরকে নিয়ে প্রথম দিকে জটিল সমস্যার পড়ে থাকি। এই সমস্ত আদর্শের কথা, বিবেকানন্দের কথা, নিত্য বস

পরিচিত হওয়া এই সমস্ত কি হয় ওয়ান টু তে ভর্তি হয়ে একটি ছেলে ষষ্ঠম নাইন-টেন ক্লাসে উঠলো আমূল পরিবর্তন তার হয়ে যায়।

যে সব ডে স্কুলার আমাদের এখানে পড়ে, দমদম থেকে নৈহাঙ্গী বহু ছাত্র আমাদের এখানে আসে। তাদের অভিভাবক অভিভাবিকারও নিত্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন বিভিন্ন অনুষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আমরা এই আশ্রমে শ্রীবিবেকানন্দের আদর্শতো বটেই তাছাড়া আমাদের দেশের যারা প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি তাঁদের আদর্শ, তাঁরাও স্বামীজী সম্পর্কে অনেক বলে গিয়েছেন তাঁরা স্বামীজীকে অনেকে ভাল মনে গ্রহণ করেছেন সেইসব আদর্শকে আমরা তাঁদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করি এবং এর ফলে আমরা আশাকরি যে যারা যেমন বর্তমানে জ্বলে ছাত্র থাকাকালীন এই স্তরে যেমন প্রভাবটা পাচ্ছে, এরা যখন কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের বিভিন্ন কাজে গিয়ে দায় দায়িত্ব নেবে তখনও তাবা নিশ্চয়ই এই আদর্শেই প্রভাবিত হবে।

P 36210

কবি শিশর গুহ'র

কায়কটি বই

জীবন জোনাঙ্কি

যোগিনী

দ্বিজস্ব বলে কিছু নেই

মদনদের দিন

পাওয়া যাচ্ছে কলকাতার

সমস্ত বইয়ের দোকানে।

শুধুমাত্র নিজের স্বার্থ দেখা নয়, নিজের ক্যারিয়ার তৈরী করা নয়

স্বামী উমানন্দ

প্রঃ পুরুষলিয়ার এই প্রত্যস্ত ভূমিতে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠটি
কবে কিভাবে গড়ে উঠল? মিশনের শিক্ষাদানে ছাত্রদের
ওপর স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাদর্শের প্রভাব কিরকম কি
লক্ষ্য করছেন?

উঃ ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী নির্ভরানন্দজীর হাতে এর ভিত্তি
প্রস্তর স্থাপিত হলেও স্কুল শুরু হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই
এপ্রিল থেকে। কেবলমাত্র ছাত্রদের জ্ঞে এবং পুরোপুরি
ভাবে আবাসিক এই বিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য
উভয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত। স্বামী হিরন্ময়ানন্দজী
এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম সম্পাদক ছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শরূপ ‘মানুষ তৈরী’ এবং ‘চরিত্র
গঠনই’ এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার মূল আদর্শ। এখনকার
এই পরিবেশে ছেলেরা তাদের যোগ্যতা ও ইচ্ছা শক্তি নিয়ে
বেড়ে ওঠে। তাদের সামনে যে আদর্শটি বড় করে থাকে
তা হল - তাদেরকে শারীরিক দিক থেকে শক্ত হতে হবে,
মনের দিক থেকে সজীব ও সতর্ক হবে, তীক্ষ্ণ দী শক্তির
অধিকারী হতে হবে, নীতিবান হতে হবে, ত্যাগ স্বীকারের
মত মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে এবং সর্বোপরি আধ্যাত্ম
আধারে বেড়ে ওঠতে হবে। শুধু মাত্র নিজের স্বার্থ দেখা
নয়, নিজের ক্যারিয়ার তৈরী করা নয়—সমাজের কাজ
করা, চরিত্র গড়া এটাই বড় কথা।

প্রঃ একটা জিনিস লক্ষ্য করা যাচ্ছে—মাধ্যমিক পরীক্ষায়

প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের রেজাল্ট খুব ভাল হচ্চে
প্রথম ২০ জনের মধ্যে অধিকাংশই মিশনের
ভাল ভাল এইসব ছাত্রদের মধ্যে ক্যারিয়ারিষ্ট
তটা প্রবণতা বিবেকানন্দের ভাবাদর্শে শিক্ষা গ্রহণ
বিবেকানন্দের মত দার্শনিক হবার নজির নেই বললেই
যাযায়ী। — কেন ?

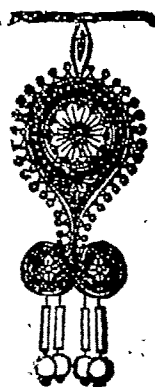
উঃ না, বিবেকানন্দের শিক্ষাদর্শে বেড়ে ওঠে সব ছাত্ররা দার্শনিক
হোক তা আমরা চাইনা। একজন দার্শনিক না হয়ে
সংকর্মী হোক, সংমামুষ হোক এটাই আমাদের কাছে
কাম্য।

অঃ আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব কৃতি ছাত্র এতদিন ধরে
বেরিয়েছে তাঁরা কি উচ্চশিক্ষা নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানের সেবার
আত্মনিয়োগ করতে ফিরে এসেছে ?

উঃ হ্যাঁ, এসেছে কেউ কেউ। আমাদের প্রতিষ্ঠানে ভো
কাজের সুযোগ কম। এই সমাজে থেকে আমাদের ছেলেরা
সংভাবে কাজ করছে এটাই বড় কথা।

বছরে একবার পুনর্মিলন উৎসব হয়। তখন অধিকাংশ
প্রাক্তন ছাত্ররাই আসে। নতুন ছাত্রদের সঙ্গে সম্পর্ক
গড়ে ওঠে। প্রতিষ্ঠানকে তারা যতদূর পারে সাহায্য
করে। প্রয়োজনে শিক্ষক, জুনিয়র গ্রামবাসীদের সাহায্য
করে। “কল্যাণ” নামে একটি সংস্থা গড়ে তুলেছে এখানে
ছাত্ররা। “কল্যাণ”—এর উদ্দেশ্য সমাজের কল্যাণ করা।
সিমলায় বিবেকানন্দের যে বাড়িটা রয়েছে ওটার সংস্কারের
অন্তে এখানকার প্রাক্তন এবং বর্তমান ছাত্ররা টাকা সংগ্রহ
করে দিয়েছে।

আমাদের শারদীয় অভিনন্দন গ্রহণ করুন—



এ, টি, জুয়েলাস

ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেঘাটা, নদীয়া
(মাছ বাজারের কাছে)

প্রোঃ—শৈলেন কুমার কর্মকার

আমাদের বিশেষত্ব—

জাড়ায়া অলংকার তৈরী
ডিজাইনে মতুনত্ব
গ্রহণত্বের দরবরাহকারী

- ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গল্পনার কথা ভাবলেই
এ, টি, জুয়েলাসের কথা ভাবেন।

বিঃ দ্রঃ—প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে।

দ্বিজেন্দ্রলাল : জীবন ও কাব্য

কাকলি ভট্টাচার্য

বাল্যজীবন ও পারিবারিক পরিবেশ

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে জুলাই কৃষ্ণনগরে দ্বিজেন্দ্রলালের জন্ম হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান কার্তিকেয় চন্দ্র রায়ের ছোট ছেলে ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তাঁর মা ছিলেন অদ্বৈত প্রভুর বংশধর কালচাঁদ গোস্বামীর বোন প্রসন্নময়ী দেবী। বর্তমান বছরটি কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্মের একশপঁচিশ-তম জন্ম বার্ষিকী।

দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি জীবন ও কবি জীবনের উপর তাঁর বাবা কার্তিকেয় চন্দ্রের প্রভাব যথেষ্টই পড়েছিল। সুকণ্ঠের অধিকারী, উন্নত চরিত্র ও তেজস্বী কার্তিকেয়চন্দ্র সমাজের উঁচু মহলে একজন বিশিষ্ট নাগরিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

চরিত্রের আভিজাত্য, তেজস্বিতা, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি বিশেষ গুণগুলি দ্বিজেন্দ্রলাল উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। তাঁর বাবার বিশেষ চরিত্রটি মনে করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত ‘দুর্গাদাস’ নাটকটি লেখেন। দুর্গাদাস নাটকের উৎসর্গপত্রে তিনি লিখেছিলেন “যাঁহার দেবচরিত্র সম্মুখে রাখিয়া আমি এই দুর্গাদাস চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছি সেই চির আরাধ্য পিতৃদেব কার্তিকেয়চন্দ্র দেবশর্মার চরণকমলে এই ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিলাম।”

দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যজীবন কৃষ্ণনগরে নানারকম গাছ পালা-ফুল-পাখী এদের সাহচর্যে বেশির ভাগ সময় কাটত। এছাড়া তাঁদের বাড়ির পরিবেশ ছিল গুণিজনের সমাগমে মুখর। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র,

অক্ষয় কুমার, ভূদেবচন্দ্রের মত সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তির।
 কার্তিকেয়চন্দ্রের অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। কোন কোন সময়
 দ্বিজেন্দ্রলাল এঁদের হেমচন্দ্র ও মধুসূদনের কবিতা আবৃত্তি
 করে শুনিয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব ও
 বাণ্যকালেব এই পরিবেশটি তাঁর সাহিত্যিক জীবনের উপর
 যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

সেকালে কৃষ্ণনগরে একটা সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল।
 সেখানকার মধ্যমণি ছিলেন কার্তিকেয়চন্দ্র। মার্গ সঙ্গীতের
 সেই অগ্নুকূল পরিবেশে দ্বিজেন্দ্রলাল নিজেকে তৈরী করার সুযোগ
 পেয়েছিলেন। তিনি অত্যন্ত অল্প বয়স থেকেই তাঁর বাবার স্মরণ
 গায়ন ভঙ্গি অনুসরণ করার চেষ্টা করতেন। কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত
 চর্চার অগ্নুকূল পরিবেশ তাঁর কাব্যচর্চায় ও সাহায্য করেছিল।
 মাত্র বার বছর বয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল কবিতা ও গান লিখতে শুরু
 করেন এবং তিনি এই সময় স্বরচিত কবিতারও সুর দিতেন।
 পরবর্তীকালে তিনি গীতিকার ও সুরকার হিসেবে বিশেষভাবে
 সুপরিচিত হয়েছিলেন।

কার্তিকেয়চন্দ্রের চরিত্র ও কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক পরিবেশের
 প্রভাব ছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভা বিকাশলাভে
 সাহায্য করেছিলেন তাঁর ‘সেজদা’ জ্ঞানেন্দ্রলাল, ‘রাঙাদা’
 হরেন্দ্রলাল ও ‘রাঙাবোদি’ মোহিনী দেবীর উৎসাহ দানে।
 রাঙাবোদি মোহিনীদেবী ছিলেন সুলেখিকা এবং সুগায়িকা।
 পরবর্তীকালে তিনি বিলিতি গানের বিশেষ ভক্ত হয়ে
 উঠেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক প্রতিভাকে গুণগত দিক
 দিয়ে পুষ্ট করতে তিনি যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের ছুল জীবন কাটে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট
 স্কুলে। তার সেজদা ও বড়দা রাজেন্দ্রলালের কাছে তিনি
 ইংরেজি শিক্ষা করতেন। বরাবরই তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন।
 এঁদের সাহায্যে তিনি ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ. পরীক্ষায়
 অনসূচ শরীর নিয়েই বেশ ভালভাবে উত্তীর্ণ হন।

কবিতা লেখার শুরু

দ্বিজেন্দ্রলাল বার বছর বয়স থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত যে সমস্ত গান ও কবিতা লেখেন পরবর্তীকালে তাই ‘আর্যগাথা’ (১ম ভাগ) নাম দিয়ে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে বই আকারে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম কবিতা ‘দেওঘরে সন্ধ্যা’ ‘নব্যভারত’ পত্রিকায় প্রকাশ পায়। আর্যগাথা (১ম ভাগ) প্রকাশিত হবার পর দশ বছরের মধ্যে কবির আর কোন বই প্রকাশ পায়নি। তবে কিছু কবিতা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল।

বিদেশ যাত্রা

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত যাত্রা করেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য স্টেট স্কলারশিপ নিয়ে। এই বিলাত যাত্রা তাঁর ব্যক্তি জীবন এবং সাহিত্যিক জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বিলাতে থাকাকালীন সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি পত্রাকারে যে লেখাগুলি পাঠাতেন তা ‘বিলাত প্রবাসী’ নাম দিয়ে হরেন্দ্রলাল ও জ্ঞানেন্দ্রলাল রায় সম্পাদিত কলকাতা থেকে ‘পতাকা’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি এই সমস্ত চিঠির মধ্যে ফুটে উঠেছে। এছাড়া বিলাতের চিঠিগুলির মধ্যে ইংরাজদের পারিবারিক জীবন, সামাজিক আচার আচরণ, রাজনৈতিক জীবন ও অন্যান্য বহু মূল্যবান তথ্য আলোচিত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের বিলাত প্রবাস কালে দুটি জিনিস গভীর ভাবে লক্ষ্যণীয়। তিনি বিলাতে থাকাকালীন ইউরোপীয় সঙ্গীত চর্চা করতেন। তাই পরবর্তীকালে গীতিকার ও সুরকার হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলালের উপর বিলিতি সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আর একটি বিশেষ ঘটনা হল—বিলাত প্রবাস কালে তিনি ‘Lyrics of Ind’ নামে একটি ইংরেজী

কাব্য প্রকাশ করেন। ইংরেজী ভাষায় লেখা হলেও এই কাব্যের সঙ্গে তাঁর লেখা পরবর্তী সময়ের বাংলা কবিতা ও গানের মধ্যে একটি আত্মিক সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল ‘Lyrics of Ind’ বইটি স্থার এডুইন আর্নল্ডকে উৎসর্গ করার জন্য কবিতার পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে তাঁকে পত্র লেখেন। স্থার এডুইন আর্নল্ড কবিকে উৎসাহ দিয়ে তা প্রকাশ করার অনুমতি দেন। কাব্যটি সে সময় বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছিল।

দ্বিজেন্দ্রলালের লেখা আর্ঘ্যগাথা (১ম ভাগ) কাব্যের-ভাব ছিল অস্পষ্ট, ‘Lyrics of Ind’ কাব্যে তা হয়েছে স্পষ্ট ও স্বচ্ছ। ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ-পরিহাস-বসিকতাই যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতিভার শেষকথা নয় তা এই কাব্যেই প্রমাণিত হয়েছে। বিলাতি সঙ্গীত শিক্ষা ও ইংরেজী কাব্য রচনা তাঁর বিলাত প্রবাসের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এছাড়া তাঁর নাট্য রচনার আকাঙ্ক্ষাও এই সময় থেকে বাস্তবে রূপ পেতে থাকে। তিনি এ সম্বন্ধে লিখেছেন—“বিলাত যাইবার পূর্বে আমি হেমলতা নাটক ও নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় দেখিয়াছিলাম মাত্র, আর কৃষ্ণনগরের এক সৌখীন অভিনেতৃদল কর্তৃক অভিনীত ‘সধবার একাদশী’ ও গ্রন্থকার নামক একটি প্রহসনের ‘অভিনয় দেখি, আর Addison-এর Cato এবং Shakespeare এর Julius Caesar এর আংশিক অভিনয় দেখি সেই সময় হইতেই অভিনয় ব্যাপারটিতে আমার আসক্তি হয়। বিলাতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমে অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তম হইয়া উঠে।” —নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালের অভিষেক হল এখান থেকেই।

দীর্ঘ প্রায় তিন বছর বিলাতে কাটিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরে এলেন। আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থা ছিল একেবারে অস্বাভাবিক। ধারা বিলাত যাত্রা করতেন তাঁরা সমাজে ধর্মচ্যুত হতেন,

শ্বেচ্ছ বলে গণ্য হতেন এবং প্রায়শ্চিত্ত করে তাঁকে পুনরায় জাতে উঠতে হত। দ্বিজেন্দ্রলাল বিলাত ফেরৎ হয়ে আসার পর তাঁর আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যথারীতি তাঁর সঙ্গে দূরত্ব সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে লাগলেন। গোঁড়া হিন্দু সমাজে কেউ কেউ আবার সামাজিক অমুশাসন মেনে তাঁকে বর্জন করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এতটা আশা করেননি, তাই তিনি বিস্মিত, ক্ষুব্ধ ও অসহায় বোধ করতে লাগলেন। তাঁর কবি প্রাণ এই আঘাতে কি এক শূন্যতায় হাহাকার করে উঠলো।

ঢাকুরী জীবন

দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন অত্যন্ত স্পষ্টবাদী এবং স্বাধীনচেতা মানুষ। বিলাত ফেরৎ এবং কৃষিবিদ্যায় এত বড় বিশেষজ্ঞ হলেও ছোটলাটি দ্বিজেন্দ্রলালের কথাবার্তায় সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তাই তাঁর কপালে জুটলো ডেপুটির পদ।

ঢাকুঘাটে বহাল হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়ে হল সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের বড় মেয়ে সুরবালা দেবীর সঙ্গে। দ্বিজেন্দ্রলালের বিয়ের সময় আরও বড় রকমের এক সামাজিক ধাক্কা অপেক্ষা করছিল তাঁর জন্ম যা তিনি কল্পনাও করেননি। তাঁর বিয়েতে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত হিন্দু বরযাত্রী যাবার জন্ম তৈরী হয়েছিলেন তাঁরা পরে সমাজচ্যুত হবার ভয়ে পিছিয়ে গেলেন। কেবলমাত্র তাঁর ভাইয়েরাই এই বিয়েতে যোগ দিয়েছিলেন। বিয়ের পরে তিনি সামাজিকভাবে প্রায় একঘরে হয়ে রইলেন। তাঁর সমস্ত ক্ষোভ, তৃপ্ত সামাজিক অস্থায়ের বিরুদ্ধে উদ্ভূত প্রতিবাদ তাঁর লেখা ‘একঘরে’ নকশা। ‘একঘরে’ নকশার ব্যঙ্গপূর্ণ শ্লেষমিশ্রিত হাসির গানে তিনি সামাজিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে যথাযোগ্য জবাব দিয়েছিলেন—

—‘যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বৈকে

প্রায়শ্চিত্ত করে ;

যবে কোন মতিভ্রান্ত, ভেড়াকান্ত

ধর্ম ভাঙে গড়ে

যদি কোন প্রবীণ বণ্ড মহাভণ্ড

পরেন হরির মালা

তখন ভাই হাসি চেপে নাহি ক্ষেপে,

রইতে পারে কোন—’

‘একঘরে’ নকশাটি প্রকাশিত হয় ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে।
পরবর্তী কালেও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচুর হাসির গান ও প্রহসন রচনা করেন।

যুবক দ্বিজেন্দ্রলালের সকল প্রেম তাঁর নববধূকে ঘিরে
বীরে বীরে বিকশিত হতে থাকে। তাঁর কাব্যের কাননে
ফুলগুলি এক এক করে ফুটে ওঠে কবি প্রিয়াব প্রেম মাধুর্যের পরশে
একদিকে যেমন তাঁর প্রেমমুগ্ধ বিহ্বল কবিত্তিত্ত স্বপ্নময় মদিরায়
অভিষিক্ত আর এক দিকে সামাজিক সম্পর্ক জটিল ও বিপর্যস্ত।
এই দুই প্রকার মানসিক সংমিশ্রণে কখনও কখনও তাঁর
কাব্যের গতি বিচিত্ররূপ ধারণ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ আর্ষগাথা-(দ্বিতীয় ভাগ)
১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এই কাব্যের অধিকাংশ
কবিতাই তাঁর প্রিয়তমা নববধূকে উদ্দেশ্য করে লেখা।
আর্ষগাথা (দ্বিতীয় ভাগ)-র কবিতাগুলি যেমনই সহজ
সুধামামণ্ডিত তেমনি তাঁর স্বপ্নের রানী প্রেয়সী বন্দনায় সুধা
মাধুর্যে ভরা। এই কাব্যের ‘উৎসর্গ’ অংশে তিনি লিখেছেন—

নয় কল্পিত সৌন্দর্য্যে ;—নয়

কবির নয়নে দেখা—পরীস্বপ্নসম,—

এসেছে প্রত্যক্ষ স্বীয় দেবীরূপ ধরি।

এই কাব্যে কবির রোম্যান্টিকতা ও গীতিকাব্যের উচ্ছ্বাস
লক্ষ্য করা যায় যথেষ্ট। আর্ষগাথা (১ম ভাগ) কাব্যের যে

অপূর্ণতা ছিল, দশ বছর পরে প্রকাশিত আর্থগাথা (দ্বিতীয় ভাগ)
কাব্যে তার পরিপূর্ণতা ধরা পড়ে।

আর্থগাথা (দ্বিতীয় ভাগ)-র ভূমিকায় কবি লিখেছেন—
“দশ বৎসরে আমার জীবনে যুগান্তর হইয়াছে—কাহার না
হয়? আজ আমি আর সে পাঠাধ্যায়ী, অনুট, জগতের
দূরস্থ পরিদর্শক নাই।—

আজ যেনরে প্রাণের মতন

কাহারে বেসেছি ভাল ;

উঠেছে আজ নূতন বাতাস, ফুটেছে আজ নূতন আলো

মলয়া নিলসপৃষ্ঠ, প্রেমোন্মাদাসিত আমার হৃদয় কুঞ্জে
তাই এই কৃতজ্ঞ অক্ষুট কুজধ্বনি।”

সরকারী চাকুরীর খ্যাতিরে দ্বিজেন্দ্রলালকে বহু যায়গায়
ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বর্ধমান ষ্টেটের
সুজামুচী পরগণায় সেটেলমেন্ট অফিসার নিযুক্ত হলেন। এই
সময় স্থার চার্লস এলিয়ট বাংলার লেফটনার্ট গভর্নর ছিলেন।
অন্যায়ভাবে খাজনা বৃদ্ধির প্রতিবাদে তাঁর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের
বিরোধ বাধলো। ছোটলাট ক্রুদ্ধ হয়ে নতুন আইন প্রণয়ন
করলেন এবং এই কেস শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টে গেল। কিন্তু
হাইকোর্টের জর্জ দ্বিজেন্দ্রলালের মতকেই সঠিক বলে মেনে
নিলেন এবং হাইকোর্টের সেই রুলিং অনুসারে এখনও
সেটেলমেন্টে কাজকর্ম চলছে।

চাকুরী জীবনে দ্বিজেন্দ্রলাল বহু তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয়
করেছেন। চাকুরীর প্রথম থেকেই নানারকম অশান্তির মধ্যে
তিনি ছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর বরাবর একটা বিরাট ক্ষোভ
ছিল। এজন্য তিনি একসময় চাকুরী ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছাও
পোষণ করেছিলেন। তাই তিনি গভীর হৃৎখের সঙ্গে তাঁর
নিজস্ব ভঙ্গিতে এক জায়গায় লিখেছেন—

“হায় শুদ্ধ অন্নচিন্তা যদি না থাকিত অন্ততঃ

দিবায় ছয়টি ঘণ্টা পরদাস্ত না করিতে হত”।

চাকুরী ক্ষেত্রে নানারকম বঞ্চাট ও অশান্তির ছায়া তাঁর সাহিত্য জীবনেও স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছিল।

গ্রন্থ প্রকাশ

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রলাল ‘কঙ্কি অবতার’, ‘বিরহ’, ‘এ্যহম্পর্শ’, ও ‘প্রায়শ্চিত্ত’ এই চারটি গ্রন্থসহ ও দুটি ব্যঙ্গ কাব্য ‘আষাঢ়ে’ ও ‘হাসিরগান’ রচনা করেন। কবি তাঁর ব্যঙ্গ কবিতায় চাকুরী জীবনের যন্ত্রণার কথা কোতুকের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন—

খেটে খেটে খেটে

রোজই আসি মুনবের শ্রীপদযুগ চেটে ;—

দীনমূর্তি দেখিলেই মুনবও যান ক্ষেপে,

রুদ্রমূর্তি দেখিলেই ভৃত্য উঠে কৈপে ;

তদীয় এক তাড়ায়

যেন বা ভূত ঝাড়ায়,

ইচ্ছা হয় যে চলে ‘ঘাই—হ্যুং ! ছেড়ে এই পাড়ায় ;

শ্রীর উপর হয় বিরাগ ; জীবনে হয় ঘৃণা ;

সংসারও হয় অসহপ্রায় গুড়ুগুড়ি বিনা।’

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে দুটি নাটক রচনা করেন। গীতিনাটিকা ‘পাষাণী’ (১৯০০খ্রীঃ) ও রাজস্থানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ‘তারাবাই’ (১৯০৩ খ্রীঃ)। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ‘মন্দ্র’ নামে একটি গীতিকাব্যও তিনি রচনা করেন। ‘মন্দ্র’ কাব্যখানি দ্বিজেন্দ্রলালের একটি অদ্ভুত সৃষ্টি। তাঁর কবিসত্তার রোম্যান্টিকতা ও ব্যঙ্গ রসাত্মক তির্যকভঙ্গি এই আপাত বিরোধী দুটি দিকই স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে এই কাব্যে।

‘আর্যগাথা’ (দ্বিতীয় ভাগ), ‘আষাঢ়ে’ ও ‘মন্দ্র’ এই তিনটি কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালকে বৃহত্তর সাহিত্যিক জীবনে সন্মানের সঙ্গে পরিচিতি দিয়েছিলেন।

এই সময় ছুই কবি পবস্পরের বিশেষ গুণযুক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে রীতিমত ঘনিষ্ঠতা ও নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সুখ দুঃখের সাথী

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ১৯শে নভেম্বর কবির ষোল বছরের সুখ-দুঃখের সাথী পত্নী সুরবালার মৃত্যু হয়। সে সময় কবি সরকারী কাজে কলকাতার বাইরে ছিলেন। তাঁর প্রিয়তমার সঙ্গে শেষ দেখা আর হয়নি শেষ পর্যন্ত। কবির সুখের নীড় ভেঙে গেল নিমেষে। এক ফুঁএ যেন সব হাসি গান অঁধারে মিলিয়ে গেল। দ্বিজেন্দ্রলাল কবি হিসেবে যখন যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং বেশ কয়েকটি কাব্য ও নাটকের সফল সৃষ্টির আনন্দের চরম মুহূর্তেই তিনি হারালেন তাঁর প্রিয়তমা পত্নীকে। যিনি ছিলেন তাঁর অস্বাস্থ্য সমস্ত অশান্তি ও বিড়ম্বনার ক্ষেত্রে ছাড়িয়ে একমাত্র আশ্রয় ও সাহায্য। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সাফল্যের গোপন চাবিকাঠি ছিল কবিজায়ার অনুপ্রেরণা। দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যক্তি জীবনের শূন্যতাকে ছাপিয়ে প্রাণ হাহাকার করে উঠলো মাতৃহারা ছুটি শিশু সন্তানের মুখের পানে তাকিয়ে।

সাহিত্য জীবন

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়—দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক জীবন প্রধানতঃ ছুটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথমতঃ তাঁর স্বামী বিয়োগের ঠিক পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এবং দ্বিতীয়তঃ কবির নিঃসঙ্গ বাকী জীবনটুকু। কবি জায়ার এই মৃত্যু আপাত দৃষ্টিতে হয়ত বাস্তব ঘটনামাত্র। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের গতি প্রকৃতি এবং সাহিত্যিক জীবনের পটভূমিকার দিক পরিবর্তন ঘটে গেল নিমেষে এই একটিমাত্র ঘটনার আঘাতে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য জীবনের দ্বিতীয় পর্ব প্রধানতঃ স্বদেশ ভাবনায় উদ্দীপ্ত। হয়ত বা প্রিন্সা বিয়োগে বিধুর কবি সেই সময়কার বহির্জগতের উদ্বেজনাকে আশ্রয় করে তাঁর সাহিত্যিক জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। ঠিক

সেই সময়ের বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তিনি পর পর কয়েকটি নাটক রচনা করেন। নাটকগুলির বৈশিষ্ট্য হল- রঙ্গমঞ্চের চাহিদা অনুযায়ী সেগুলি লেখা।

বিলাত থেকে ফিরে এসে দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতার বিভিন্ন থিয়েটার হলে অভিনয় দেখেছেন। সে সময়কার নাটকগুলিতে ঠিক উচ্চমানের ভাব ও ভাষা ব্যবহৃত হতনা। এ কারণেও দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্য রচনায় মনোযোগী হয়েছিলেন।

কলকাতা বাস

১৮৯৮ খ্রীঃ থেকে ১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত এই সাত বছর কবি কলকাতায় ছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে বিভিন্ন কাজে অবশ্য মকস্বেলে যেতে হত। প্রথমে তিনি বেচু চাট্‌জ্জ্য স্টীটে এবং পরে ১নং ঝামাপুকুর লেনে বাসা নিয়েছিলেন। শ্রীর মৃত্যুর পরে ৫নং সুকিয়া স্টীটের বাসায় চলে যান। সুরবালা দেবীর মৃত্যুর চার বছর আগে ২নং নন্দকুমার চৌধুরী লেনে দ্বিজেন্দ্রলাল শ্রীর নামে একটি বাড়ি তৈরী করেন। বাড়ির নাম দিয়েছিলেন—‘সুরধাম’। বাড়ির নামকরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—‘এ যে তাঁরই যশ সঞ্চিত অর্থের পুণ্য মন্দির। এখানে আমি তাঁর দিব্যমূর্তির আশ্রয় ছায়ায় আমার এ শূন্য জীবনটা কাটিয়ে দেব।’

মজলিসী দ্বিজেন্দ্রলাল

দ্বিজেন্দ্রলাল বরাবরই সদালাপী মজলিসী মানুষ ছিলেন। শ্রীর মৃত্যুর পর তাঁর বাসায় স্ত্রানী গুণী, সাহিত্য রসিক বন্ধু-বান্ধবের যাতায়াত আরও বেড়ে গেল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘পূর্ণিমা মিলন’ নামে একটি সম্মেলন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি পূর্ণিমায় বহু খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক বন্ধুদের উপস্থিতিতে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। প্রথম ‘পূর্ণিমা সম্মেলন’ দ্বিজেন্দ্রলালের সুকিয়া স্টীটের বাসায় আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে ‘সে আমার জননী’

গানটি গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেছিলেন। ‘পূর্ণিমা মিলন’ প্রায় দু’বছর ধরে নিয়মিত চলেছিল। এরপর দ্বিজেন্দ্রলাল কলকাতা থেকে বদলি হয়ে গেলেন। ‘পূর্ণিমা সম্মেলন’ও অনিয়মিত হতে হতে একসময় একেবারে বন্ধ হয়ে গেল।

স্বদেশ ভাবনা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশ ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়কার জাতীয় ভাবনা ও উৎকর্ষকে বহু কবিতা ও গানে রূপ দিয়েছিলেন। তারমধ্যে ‘আমার দেশ’ ‘ভারতবর্ষ’ ‘ধন ধান্দে পুষ্পে ভরা’ ইত্যাদি গানগুলি প্রচুত খ্যাতিলাভ করেছিল এবং এখনও এই গানগুলি আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে শিহরণের ঢেউ তুলে সাড়া জাগিয়ে যায়। এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম দিকে অঙ্গশ্র হাতির গান লিখেছেন। তিনি এখনও হাতির গানের রাজা নামে অভিহিত।

স্বী বিয়োগের পর দ্বিজেন্দ্রলাল মাত্র দশ বছর জীবিত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি অধিকাংশ জনপ্রিয় ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটক ও প্রহসন লেখেন।

গয়ায় বদলি হয়ে তিনি ‘নূরজাহান’ নাটক ও ‘মেবার পতনের’ কিছু অংশ লিখেছিলেন। ১৯০৮ খ্রীঃ থেকে ১৯০৯ খ্রীঃ পর্যন্ত তাঁর লেখা ‘নূরজাহান’ ‘মেবার পতন’ ‘সোরাব রুম্ম’, ‘সীতা’, ‘সাজাহান’ প্রকাশিত হয়। ১৯১১ খ্রীঃ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিখ্যাত নাটক ‘চন্দ্রগুপ্ত’ এবং ‘পুনর্জন্ম’ নামে একটি প্রহসন লেখেন। ১৯১২ তে পরপারে ‘ত্রিবেণী’ ও ‘আনন্দ বিদায়’ প্যারডি প্রকাশিত হয়। ‘আনন্দ বিদায়’ প্যারডিখানি মূলতঃ রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেই লেখা। পূর্বকার সেই প্রতির সম্বন্ধ শেষ পর্যন্ত আর টেকেনি।

রবীন্দ্র প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্যিক বিতর্ক ও মতানৈক্যের দানা ধীরে ধীরে বাঁধছিল। সে সময় রবীন্দ্র

সাহিত্যের প্রচণ্ড একাধিপত্যের যুগেও দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর বিরুদ্ধে ছুটি বিরাট অভিযোগ এনেছিলেন। —রবীন্দ্র কাব্যে অস্পষ্টতা ও তাঁর সাহিত্যে দুর্নীতি। বেশ কয়েক বছর ধরেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে মসীযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে তাঁর শেষ এবং চরম আঘাত ‘আনন্দ বিদায়’ প্যারডি। ‘আনন্দবিদায়’ প্যারডিখানি স্টারে অভিনীত হলে দর্শকেরা সেদিন প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। নাট্যকার স্বয়ং হয়তো বা সেদিন তাঁর ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। তা সত্ত্বেও দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা করতেন গভীর ভাবে।

শেষ জীবন

দ্বিজেন্দ্রলালের শেষ জীবন বিভিন্ন রকম অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটে।

স্ত্রী বিরোধের পর থেকে তাঁর দেহ ও মন ক্রমশঃ অপটু হয়ে আসছিল। ১৯১২ খ্রীঃ তিনি বাঁকুড়া থেকে মুঙ্গের বদলি হন। এই সময় তিনি সন্ধ্যাস রোগে আক্রান্ত হলে এক বছর চাকুরী থেকে ছুটি নিতে বাধ্য হন। ১৯১৩ তে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন। ১৯১৩ খ্রীঃ ১৭ইমে সন্ধ্যাস রোগে প্রবল ভাবে আক্রান্ত হয়ে কবি-নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর প্রিয়ান্বৃতি বিজড়িত ‘সুরধামে’ ইহলোকের পালা সাক্ষ করে চলে গেলেন কোন্ অচীনলোকে। তাঁর লেখা ‘ভীষ্ম’, ‘সিংহল বিজয়’, ‘কালিদাস’, ‘ভবভূতি’, ‘গান’ ‘বঙ্গনারী’ তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের মৃত্যুর প্রায় দশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র পুত্র দিলীপ রায়কে লিখেছিলেন—“তোমার পিতাকে আমি শেষ পর্যন্ত শ্রদ্ধা কবেছি। সে কথা জানিয়ে তাকে ইংলণ্ড থেকে আমি পত্র লিখেছিলাম, শুনেছি সে পত্র তিনি মৃত্যু শয্যায় পেয়েছিলেন এবং তার উত্তর দিয়ে ছিলেন, সে উত্তর আমার হাতে পৌঁছয়নি।”

কবি ও নাট্যকার এবং হাসির গানের রাজা ডি. এল. রায় উত্তরসূরীদের চিন্তায় ভাবনার ‘এখনও’ শ্রদ্ধার আসনে অসীণ। তাঁর সাহিত্য সম্ভার আজও বাঙ্গালীদের গৌরবের বস্তু।

চোরাটেউ

শতক্র মজুমদার

[শতক্র মজুমদারের শৈশব কেটেছে হাওড়ার আন্দুলে। বর্তমানে ছগলীর চন্দননগরে স্থায়ীভাবে বসবাস। ছোটগল্প এবং ছোটদের গল্প লিখে থাকেন। ইতি মধ্যেই ছোটদের একটি গল্পের বই ‘কাঁদন নামে একজন’ প্রকাশিত হয়েছে। ছোটদের ক্ষুদ্র লেখা গল্প অধিকাংশ দৈনিক কাগজে প্রকাশিত হয়েছে এবং হচ্ছে। ছোট গল্প লিখেছেন পরিচয়ে, চতুরঙ্গে এবং অস্ত্রান্ত বহু লিটল ম্যাগাজিনে।]

কাল সাঁঝবেলায় দাশনগরে মেলা দেকতে গিয়ে হাসি আর ফিরল নি।

‘এই ফিরলো এই ফিরলো’ করে মাঝ রাত আঁধি ঢুলতে ঢুলতে আন্না কালী শুয়ে পড়েছিল। সাত সকালে ঘুম থেকে উঠে দেকল কলাইয়ের বাটিতে রুটি-তরকারি যেমন কে তেমন। তবুও ভাবল, ঢকুরের আগেই হয়ত এসবে। সেবার যা হল আর কি। রামতলায় ম্যাজিক দেকতে গে (গিয়ে) পিসির বাড়ি রাত কাটিয়ে পরের দিন একটা আন্তো চালকুমড়ো নিয়ে হাজির। কুমড়োটা যে পিসির গাছের, তার কোনো মানে নেই বাজার থেকে কিনেও আনতে পারে। মায়ের মুক বন্ধ করার ফিকির। তা আন্না কালী কিছু বলেনি। হাসির একটা চোখ কানা। যেখানেই থাক, এঁড়ে গোরুর মতন ঠিক চলে এসবে।

সকালের কুয়াশা-টুয়াশা সরিয়ে রোদ্দুর ঘরের আনাচে-কানাচে। মোড়ের মাথায় টিউকলে ভিড় লেগেচে এনতার।

একমুখ সাবানের ফেনা নিয়ে নতু মিত্তিরের বউ বেড়া

সরাল, 'কয়রে হাসি আজ যে আমরা একটুস
পাঁচ বছরের ছেলেটা দাওয়ায় ।
আম্মাকালীর বুক চুষছিল । লোক দেকে চোঁ
সেঁদিয়ে গেল । এটাই কোলের । যখন ত
অব্যেসে দাইড়ে গ্যাচে । আম্মাকালীর বু
তবুও বায়না ।

বুকে কাপড় টেনে আম্মাকালী বলল,
বাড়ি গ্যাচে—আমিই কাজটা কোরে দে এসে
মিষ্টির বউয়ের সুন্দর গাল গইড়ে পড়চে মাজ
হাতের চেটোয় সেটা মুছে বললে, 'তাড়াত
আম্মাকালী ঘাড় কাত করে জানান দিল,
তখন উঠোনে । ডাল থেকে খেঁজুর পাতা
করচে । চাটাই হবে । সে বলল, 'সন্তি
গ্যাচে ? 'হ্যাঁ, তেমন ধারাই তো বলে ছেল

ছেলেটা ছুটে এসে ফের আম্মাকালীর
গলাতে যাবে, তাকে ঠুকে বসিয়ে দিল মাটিতে
যাবুনি নাকি ?'

সেও ছেড়ে দেবার নয় । উপুর হয়ে ম
চাপড়ে, চিল্লিয়ে বাড়ি মাত করতে লা
বেইরে গ্যাচে । থাকলেই বজ্রিনাথের ধান
কাজের মানুষ অকেজো হলে যা হয় । ছ
বক্ বকানি ।

আম্মাকালী চলে যেতেই ঘুট্ট এসে
দিল । এমনি এমনি বলল নি । হুহাত
'১০টা পয়সা দাও—'

—কোতায় পাবোরে পয়সা ?

বজ্রিনাথ ভাবচে অশ্রুকণা । সারারাদি
হয় না, মেস্টেটা কি থালে— ।

—১০টা পয়সা, ১০টা পয়সা দাও ।

জেলট। এধার থেকে খুয়ে শুধায়ে যায়। ওধার থেকে
এধারে। অধার একই কথা বলে বারবার। দিতে হল
শেষমেশ। ঝালাই মিত্তিরিকে একটা চাটাই বেচে আদৈক
দাম পেয়েছিল। তার আদৈক অমরনাথকে দিয়ে বিভিন্ন দাম
মেটাল কিছুটা। তা'ব থেকে ১০টা পয়সা খেঁটুকে দিতে টা'কে
মান্দব ৬০টা পয়সা।

পয়সা নে (নিয়ে) খেঁটু ছুটল পড়ি কী ময়ি। এ্যাভকণ

মাটিতে শুয়ে যেটা সানাই বাজাচ্ছিল, সেও দাদার পেছন ধরল।
পিসির বাড়ি থেকে যদি ছুকুরে নেয়ে খেয়ে বেরোয়, থালে
ফিরতে ফিরতে সেই বৈকাল গড়াবে। এসব ভাবনা-চিন্তা
করেই হাসির আর ভাতের চাল নেয় নি আম্মাকালী।
এমনিতেই চাল বাড়-বাড়ন্ত। একটু তবু সুবিধা হল।

এক থালা ফ্যান-ভাত সাবাড় করে ঘেঁটু পাত চাটতে
চাটতে বলল, আর ছুটি ভাত দাও না মা, দিদি এসবে নি—’

আম্মাকালী বলল, ‘তুই জ্ঞানলি কী করে ?

‘অয় ওয়া বলছেল।’

‘কারা ?’

অপাং করে ঘেঁটু বলে দিল, ‘মন্টার দিদি।’

তার মানে সুল্লরী। তর সইল না আর। এরই মধ্যে
রটাতে শুরু করেছে। হাড় হারামজাদি। আম্মাকালীর চিনতে
বাকি নেই। নিজে বছরের মধ্যে পাঁচবার পেট খসাকে, সে
আবার অন্তের লেজুড় বার করে। ঘেঁটু ফের বলল, ‘ছুটো
ভাত দাও না—’

আম্মাকালী থালা ঠুকে ভাত দিয়ে বলল, ‘খেয়ে উঠে
সুল্লরীকে একবার ডেকে আন—’

ঘেঁটু চুপ। ছোটটার নাক দিয়ে শিকনি গড়াচ্ছে।
ভাতের সঙ্গে মাখা-মাখি হয়ে তা-ই পেটে যায়। সে বলাল,
‘মা মারবে নাকি গো ?’

আম্মাকালী ধমকে ওঠে, ‘খেয়ে উঠে পড় শিগগির বাপ
খেতে বসবে।’

বানিক পরে ঘেঁটু এসে খপর দিল, ‘ও বললো বৈবাহ বেলা
আসবে—’

আম্মাকালী কিছু বলে না। এঁটো-কাঁটা মুছে কাজে
বেইরে যায় সে। দস্তদের বাড়ি দ্ধার কাচা আছে। দ্ধাকা
বাড়ি। ছোট ছোটো এসময়ে ঘরে থাকে না। বাজারে গ্যাচে
পয়সা খুঁজতে। ছুকুরে নাকি রথতলার বাজারে পয়সা পড়ে

থাকে। এসব বাপের জন্মেও শোনেনি বড়িনাথ। সস্তা-গণ্ডার বাজারেও না। এখনতো কতাই (কথাই) আসে না। তা এসব ছোট ছোটো বোঝায় বাপকে। শোনার কথা শোনে বড়িনাথ। তবে সে তো আর হুদ ভাত খায় না, বোঝে সব। শুধু বলে ছেল, ‘বাজারে বাঁধা কপির পাতাও তো এখন আর পাওয়া যায় না—আর তোরা খুঁজলেই পরসা পে যাস?’ দেকিস বাপ, আমার ধরাটরা পড়লে ঠ্যাঙানি খেয়ে মরে যাবি কিন্তুক—’

‘বড়িনাথ আছো নাকি—’

সাইকেল ঘন্টি বাজিয়ে কে ডাকল। বড়িনাথ ঘাড় ফেরায়। রতন ডাক্তাবের ব্যাটা। হাড় বিটকেল ছেলে। কালীতলার স্কুলে পড়ার সময় খোলাম কুঁচি ছুঁড়ে হাসির চোখ কানা করে দিয়েছিল। বড়িনাথ তখন যোয়ান মাছুষ। নিত্য ছবেলা হেঁটে মোড়ি গ্রামের চটকলে ফুরণের কাজ করতে যেত। ছুট-হাটার দিনে পচা নারকোলের বড়া দিয়ে হাঁড়ি হাঁড়ি ভাড়ি সাবাড় করে জুং থাকতে পারত। তা খপর শুনে রতন ডাক্তাবের বাড়িতে গেছিল সে। জল ঘোলা হবার আগেই কড় কড়ে ১০০টা ট্যাকা বার করল ডাক্তাববাবু। আঙ্গ অঙ্গি এসব কেউ জানেনা। পরেও সেই বাড়িতে বেড়া বেঁধেচে বড়িনাথ। জঙ্গল সাফ করে এরচে।

ছেলেটা জানাল, বাড়ির পাঁচিলে এক বুক সমান জংগল গইজেচে—সেটা কাটতে হবে আজ কালের মধ্যেই।

বড়িনাথ বলল, ‘শরীলটা বড় খারাপ—

ভারী কাজ করতে পারকনি—’

‘ও আচ্চা,’ বলে সাইকেলে উঠল ছেলেটা।

সেবার বড়িনাথ যা করলে, ঠিক হয় নি কাজটা।

১০০ টাকায় মেয়েটার চোখের ব্যারাম সারাতে পারত সে। করল নি। মদ আর জয়াতে উইড়ে দিয়েচে দেদার। মেয়েটার চোখ ভাল করলে বিয়ে-থা’র ব্যবস্থা করা যেত। আলুওলা সহদেবের ছেলের সংগে সম্বন্ধ করতে গেছিল বড়িনাথ।

তো সাক্ষ্য জাইনে দেল, 'কানা মেয়েকে ছেলের বউ
করতে পাররনি—'

বলতে গেলে সেটা হল গিয়ে বদ্যিনাথের বিরাট একটা
প কাছ। খোলাপ কুঁচি ছুঁড়ে ছেল ১০ বছরের ছেলেটা
এর তার বাপও নয় ট্যাকা দিয়ে দোষ চাপা দিতে চাইল!
কিন্তু মেয়ের বাপ হয়ে সেই ট্যাকায় ক্ষুতি করল বদ্যিনাথ
ভাবা যায়! রতন ডাক্তারের সেই ছেলেটা আজ ডাগর হয়েছে।
তাকে দেখলে আজো বদ্যিনাথের ১৫ বছর আগেকার কতা
মনে দাগা দেয়। নিজের ওপর রাগ হয়। হুঃখু পায়।

ছেলেটা চলে যেতেই উঠে দাঁড়ায় বদ্যিনাথ। বিড়ি
বরায় উঠোনে পায়চারি করে।

সাঁঝ বেলাতে মুকিয়ে-চুরিয়ে দেকা করল সুন্দরী।
সাঁতারাগছিতে গেছল। তার সংগে নাকি হাসির দেকা হয়েছে।
সেই ট্যাকা পাঠ্যে দেছে। হুঃখানেক বাদ ঘরে এসবে।
দাওয়া থেকে সব শুনল বদ্যিনাথ। কিছু বললে না।
ভাঁড়ার ঘরের কোটোকাটার ভেতর ট্যাকাগুলো মুকিয়ে
রাখল আন্না কালী।

বদ্যিনাথ ফের বেইরে পড়ে। মোড়ের মাথা থেকে ঘুরে
আসে একটুস। কতজনে যে মেয়ের খপর জিগ্যেস করল তার
ঠিক নেই। হালফাল জবাব দেয় বদ্যিনাথ। নোকে শুনে
যায়। কিছু বলে না। বদ্যিনাথ জানে এরপরে খপর বাতাসে
সাঁতার কাটতে শুরু করবে। কেছা-কেলেংকারি পাঁচকান
হতে সমস্ত নাগে না।

ঘরে এসে ফের দাওয়ায় বসল বদ্যিনাথ। পাশে আন্না কালী।
বদ্যিনাথ বলল, 'হ্যাঁগো কালকে ঠিক এস্বে তো?'
আন্না কালী ফিসফিসিয়ে বলল, 'কাল এস্বে কিনা জানি
না—তবে এস্বে তো একদিন না একদিন।'

বদ্যনাথ ভাবল, বউ কিছু নুকোছাপা করতে পারে।
সে চেষ্টা করেও জ্ঞানতি পারবে না। মেয়ের চোখের তরে
১০০ টাকা পেয়েছিল বদ্যনাথ। সে কতা আজ অন্ধি বউ
জ্ঞানে না।

দাওয়া জুড়ে ঘুটঘুটে আঁধার।

দিন ভোর দাপাদাপির পর ছেলে দুটো ঘুমে কাদা।
পেটের টান পড়লে উঠবে ঠিক। দুজন মুখোমুখি বসে রইল
চুপচাপ। কোনো সাড়া-শব্দ নেই। অঁচল-দিয়ে চোখের
জল মুছল আম্মাকালী। বদ্যনাথেরও চোখের কোণায় জল।
আঁধারে কেউ কারো মুখ দেখতে পেল নি।

টুকরো খবর

**‘ছান্দিক’ নাট্য সংস্থার বিশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে
আয়োজিত নাট্যোৎসবে তথ্য প্রসারের জন্য
আবেদন**

মুর্শিদাবাদ জেলা বহুবমপুর্বের ‘ছান্দিক’ নাট্য সংস্থার
বিশবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১৯৮৮ র ২২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত
এক নাট্যোৎসবে জেলা ভিত্তিক বিভিন্ন গ্রুপ থিয়েটারের
পরিচিতি, বিভিন্ন জেলার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্বের পরিচিতি
ইত্যাদি সহযোগে আজকের নাটকের ধারা পর্যায়ে একটি
প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ মদ্যীয়া জেলা তথ্য আধিকারিক শ্রী নারায়ণ
চন্দ্র বসু এই জেলার বিভিন্ন নাট্য সংস্থার কাছে নিম্নবর্ণিত
তথ্যগুলি অক্টোবর মাসের মধ্যে পাঠাতে অনুরোধ করছেন।

১। গ্রুপ থিয়েটারের নাম ও ঠিকানা ২। প্রতিষ্ঠা
কমিটি ৩। বর্তমান সদস্য সদস্য সংখ্যা ৪। প্রযোজনা
সংখ্যা ৫। বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রযোজনা ৬। বর্তমান
বাংলা নাটক প্রযোজনার ধারা সম্পর্কে আপনার গ্রুপ
থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত সূচিস্তিত মতামত।

লোটনী

সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী

[গ্রাম বাংলার একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ও কবি সুধাংশু শেখর চক্রবর্তী। বাঁকুড়া জেলার শালতোড়া থানাস্থগত বর্ধিষু তিলুড়ী গ্রামে বাস।

প্রায় ৫০ বৎসর ধরে বহু পত্র/পত্রিকায় নিয়মিত লিখছেন। প্রকাশিত কোন কাব্যগ্রন্থ নেই। স্থানীয় এলাকা থেকে ‘রাজলক্ষ্মী’ ‘সূর্য প্রণাম’, ‘মুক্ত কবিতার মুখ’ কাব্য সংকলন সম্পাদনা করেছেন বিভিন্ন সময়ে।

‘কৃষ্ণ মূর্তিকা ছুঁয়ে’ নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হতে চলেছে। ‘লোটনী’ গল্পটি তিলুড়ী অঞ্চলের বাউরীদের কথ্য ভাষার উপর ভিত্তি করে লেখা।]

মা মরা মিয়াট ছাখতে ছাখতে বড্ড ডাগর হুইয়ে গেল। মাথাটয় হাত দিয়ে বৈশ্যে পইড়ল্য ভূষণ। জলের মতন বছর গলা পিরায় যাচ্ছে, ছিলাট সেই গ্যাল ত সেই গ্যাল। পনর বছর হুইয়ে গেল ফিরে আইসবার নাম নাই। ভূষণই এখন লোটনীর বাপ-মা সবই। লোটনী কাঁইন্দলে ভূষণও কাঁইন্দে। ভূষণের অ্যানেক বয়স হৈল, চখের ঠাহর কম বেশি কাজ কইরলেই দম্ উঠে। লোটনীকে ঘরে একা ছাড়ো যাতে মন সরে না। ডাগর মিয়া কত বেপদ আপদ আছে, কিন্তুন উপায় নাই যাতেই হয়। তা নাইলে খাতো পাবেক নাই। লোটনীর চাঁদের পারা মু, শরীল তলয় যেন পিতিমা। কালী, ছুগ্গা মনসা অ্যানেক ছাখেছে ভূষণ

কিন্তু লোটনীর মতন নয়। ভদ্র ঘরের মিসার মতন,
লোটনী পিতিমাই বটে। ভূষণ লাতনীকে বলে অ্যাই লোটনী
তুই ডাগর হইয়েছিস সামাল্যে চলবি।

—তুর কুমু ডর নাই দাছ।

—বেস্ বেস্। এই ঠেনে বেস্। অ্যাই ছাখ তুর লাইগ্যে
কী আন্তেছি ছাখ্ বল্যেই রূপার খাডু বাজু মল লোটনীর
হাতে তুল্যে দিলেক ভূষণ।

—ইগুলি কি কইরব দাছ? পইরব না কি?

—না না, অখন লয় বিয়ার সময় পইরবি। তুকে পরির
পারা মানাবেক।

—কার সঙ্গে বিয়া দিছিস শুনি?

—উ পাড়ার লখ্যার ব্যাটা মদনার সঙ্গে। ছিলাট ভালই
বটে। খুবই খাটে খাওয়াতে পাইরব্যেক।

বুড়া বয়সেও ভূষণ খাইটতে গেছে। লোটনী একা একা
ঘরে বইন্তে ভাবছে বিয়ার কথা। মদনার মু-ট ভাশ্তে উইঠল্য।
লোটনীর শরীলট শির শির কর্যে উইঠল্য। দাছ বৈল্যে
গেইছে গগলি রাইন্ধতে। দাছ বৈল্যেছে এ লাতনী তুর হাতে
গগলি রাঁধা ভালই লাগ্যে। তাইত লোটনী গাছ কোমর
বাঁধ্যে সিধা চল্যে আইল্য বাবুদের পথৈরে। বাবুদের
পথৈরের গগলি গলা ভালই বটে ডাগর ডাগর। পথৈরে
আইন্তে চখোর ছামুতেই তাখে মদনাকে গরু খুয়াছে।
পথৈরে আর কেউ নাই মদনা আর লোটনী। ডরাই
ডরাই মদনা লোটনীর কাছে চল্যে আইন্তে বইল্ল্যেক।

—এ লোটনী শুমেছিস তুর সঙ্গে আমার বিয়া হবেক?

—লোটনী রা কাড়েনা।

—রা কাড়, ছদিন বাদেই বিয়া হবেক ডরটা কিসের শুনি?

—হঁ হঁ শুন্তেছি। তুই অখন পালা ইখান থাইক্যে। লোক
আইসব্যেক!

—লোক আশুক কেনে তুই ত আমার বউ হবি। শুন

তাহ তুর লাইগ্যে দশটা টাকা রাখ্যেছি বল্যেই দশটা
লোটনী কাইল্কে ধম্ম রাজের মেলা হবেক যাবি ? অ্যাই
আদুল দেখাল্য লোটনীকে । কাইল্ তুকে অ্যানেক খাওয়াব ?
যাবি বল ?

—কিস্তন কার সঙ্গে যাব ?

—কেনে আমার সঙ্গে ।

—আমাব লাক্স লাইগব্যেক্ ।

—মনটকে চাঙা কর লোটনী সব ঠিক হইয়ে যাবেক ।

—কখন যাবি ?

—কাইল্ সকালে । আমি তুব লাইগ্যে সড়প ধারে দাঁড়াই
থাইক্বে । আস্বি ত ?

—হঁ হঁ তবে আইস্বে ।

কথাবার্তা পাকা হইয়ে গেল । মদনা গরু ধুয়াই চল্যে গেল ।
আড় চক্ষ্যে লোটনী মদনাকে একবার ত্যাখে লিল । লোটনীর
শরীলটয় খুশির হাওয়া বইয়ে গ্যাল ।

রাতো দাহুর কাছে শুয়ে থাক্যে লোটনী । একবার
একট ছড়া আশ্বেছিল । লোটনী ট্যাচাইছিল তাতেই ভূষণ
জাগ্যে গেইছিল নইলে.....সেই থাক্যেই লোটনী দাহুর
কাছেই শোয় । চাঁদট ডুবে যাছে, এমন সময় লোটনী স্বপ্ন
ত্যাখে —মদনার হাত ধইররে ধম্ম রাজের মেলার দিকে চইল্ছে ।
মদনা মদনা কর্যে চৈচাই উইঠল্য লোটনী । লোটনীর
ট্যাচানিতে ভূষণের ঘুম ভাঙ্যে গেল ।

—ভূষণ বইল্লেখ্যক কি হৈল লাতনী উঃ শালাকে স্বপ্ন দেখলি
নাকি ?

—লোটনী লাজের মাথা খাঁয়ে বইল্লেখ্যক হঁ দাহ্ । মদনা
বইল্ছে সকালে ধম্ম রাজের মেলা যাবেক আমাকেউ যাতে
বইল্ছে ? তুই বলিস ত যাব দাহ্ ?

—তুই কি বইলেছিস্ লাতনী ?

—যাব ।

—ডুব্যে ডুব্যে জল খাছিস্ লাতনী ?

কইলুকা গাছে ফুল ফুটেছে। লোটনীর চৈখট ওইফুলের
দিকেই। লোভী ভমরা ঘুরছে ফিরছে। নজের বুকটর
দিকে তাকাল্য লোটনী। তারও বুকটর মধু জমেছে।
গরবে লোটনীর বুকট ফুলে উঠে। মদনা তার মরদ হবেক।
মদনার গতর আছে ছু ছনাতে খাটো খুটো সংসার গইড়বার
সঙ্গে মশগুল লোটনী। দাছুর ডাকে ভুল্যে গেল চিন্তাগুলো।

বলি এ লাতনী বিয়া ট তুর না আমার ?

—কেনে দাছ ?

—কেনে। তুর মনে রং লাগেছে বলেই হাশ্বে উইঠল্য।

—বলি লোক আইসব্যেক্ ? কি খাত্যে দিব ?

—মছয়া।

—কোথায় পাবি ?

—সে তুকে ছাখতে হবেক নাই দাছ। উ বলেছে সব বেবস্থা
কর্যে দিবেক।

—তাই নাকি ?

—হাঁ।

আজ লোটনীর বিয়া। ষরট গম্গম্ কইরছে। মাদলের
জিমি জিমি শব্দে বাউরি পাড়া সরগরম। এক পাতনা মছয়া
আছে। সবাই খাছে সবারই চৈখ লাল জবা ফুলের
পারা। সবাই নাচ গান কইরছে। জোছনায় ফিন্ ফুটেছে
রাইত্ ট ভাল। ইদিকে মদনা দলবল নিয়ে হাজির। বাউরি
হল্যেও ভদ গাঁয়ে বাস ভুষণেব। বরযাত্রীদের ভালো করে
খাওয়ালো ভুষণ। অখন বিয়া হবেক। খাঁয়ে দাঁয়ে সবাই
বিডি টানছে, আর ইদিকে মিন্গাগুলো শাখ বাজাছে।
ছুট্ ছুট্ ছিলারা নাচের তালে তালে বলে থিয়া থিয়া থিয়া।
আজ লোটনীর বিয়া।

এতদিনে ভুষণের বুকট হাল্কা হৈল।

প্রতিশব্দ :

মিয়াট—মেয়েটা। বিয়া—বিবাহ। মুট—মুখটা।

পঠেরে—পুকুরে। রা কাড়া—কথা বলা। ছড়া—ছেলে।

চৈখ—চক্ষু। ছুড়ির—মেয়ের। মছয়া—মদ।

— লোটনী ফিক্ করো হাসে ।

ভূষণ আবার ঘুমিয়ে পড়ে । কিন্তু লোটনীর চোখে ঘুম নাই, ইদিকে টুগ্ টুগ্ ফর্সা হইয়ে আইস্ছে মোরগট ডাকো উঠল্য, পাখ্যের কিচ্, কিচ্, চৈচানিতে সকাল হৈল । বিছানা থাকো উঠল্য লোটনী । উনান ধরাই চা করো খাওয়াল দাছুকে, নিজেও খাইল্য, হাত কচাল্তে কচাল্তে লোটনী দাছুকে বইল্যেক—

— কি দাছু যাব ?

—উ শালার সঙ্গে তুর মন মজেছে যাবি নাই, যা যা, এই লে ছটা টাকা । মেলা বল্যে কথা । টাকা নিয়ে হাওয়ার মতন চল্যে গেল লোটনী ।

—ভূষণ ভাবে উ ছুড়ির মন মাইন্যেক কেনে । য়ুয়ান মিয়া, যৈবনের দোষ যাক্ উরা স্মখে থাকুক । এই মাসেই বিয়া দিব

ইদিকে সড়পে পা দিয়েই খুঁইজছে মদনাকে । পেছন থাক্যে আইস্ছে মদনা ছপ কর্যে লোটনীর হাত ধর্যে ফেল্যে চল্

মদনাব হাতটা ছুঁয়া বাত্যেই লোটনীর শরীরট কেমন কর্যে উঠল্য ।

—মদনা লোটনীকে বইল্যেক তুর লাইগ্যে রাত্যে ঘুম হয় না । কেনে বলত লোটনী ?

—ই সখ ছাখনা ।

—তুকে না দেইথে রইতে লারি ?

—তাই নাকি ? যদি তুকে বিয়া না করি ?

—কেনে ? আমি কি প্যাচার পারা খারাপ বটি ?

—খিল্ খিলায়ে হাস্ছে উঠে লোটনী ।

—কি বইল্বে লোটনী, তুকে কত ভালোবাসি ?

—তাই নাকি ? নারে মদনা তুর সঙ্গেই বিয়া হবেক ।

এক সময় মেলায় আস্ছে পইড়ল্য । অ্যানেকঙ্গ ঘুর্যে ঘুর্যে মেলা দেইখল্য, একট দোকানে আস্ছে জিল্পী কিনে ছ জনাতে খাইল্য । মেলাব ছামুতেই একটা গড়্যা ছ জনাতে আইস্ছে হাত ধুইল্য । আরেকট দোকানে আইস্ছে ছটা পান কিনে মুটে পুরে ঘরের দিকে পা বাড়াল ।

কবিতা

দুগ্‌গা

ঈশান চন্দ্র ঘিষ

রেতের বেলায় শিউলি তলায়

যাসনে লো বউ

গন্ধ ভূতে ফাঁদ যে পাতে

জানিস কি কেউ ?

শিশির ভেজা পিছলা পাতা

চাঁদনী রাতে শিউলি সাদা

হুগ্‌গা ঠাকুর দাঁড়িয়ে বুঝি

দেখবো বলে তারেই খুঁজি।

সকাল বেলায় আলতা পারে

কে যায় লো মেঠো পথে

ও মা লো মোদের হুগ্‌গা

কী সৌন্দর্য পদ্ম হাতে।

আগুন

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

চোখের ভেতর

আগুন জ্বলে

পেটের আগুন

হৃদপিণ্ডে

আগুন জ্বলে সর্বত্র

অন্ন দে মা, অন্ন দে,

মায়ের চোখে

কোথায় আগুন ?

মায়ের চোখের জল শুকায়ে,

শুকনো লোনা জলের ধারায়

ভুখা শিশু মুখ লুকায়।

আবার উন্মাদ হতে

(নজরুল স্মরণে)

মধুসূদন পাল

হৃৎপিণ্ডের মাঝখানে
লাল টুকটুকে রক্ত
জীবন্ত নয়, মৃত ।
বুকের গভীরে স্বদেশ মত্ত
জাগ্রত নয়, ঘুমন্ত ।
ছ'চোখে বেদনার অশ্রু
শাসক আর শোষকের নির্ভর করাঘাত
অন্ধকারে খেলা করে শাপিত ছুরি
খাপদেরা চেটে খায় কান্নার লবন ।
নজরুল ! মৃত্যু তোমাকে ছুঁয়ে
বাঁচিয়ে দিয়েছে
নইলে জন্মভূমির এ' যন্ত্রণা-দেখে
হয়তো আবার উন্মাদ হতে !

সন্তান

সুপন রায়

মহাভাগু থেকে
উজ্জল কোটার মতো
যদি বলি চাঁদই নেমেছ
বুকের উপত্যকায়
কিহা কোনো অতিবেল সমুদ্রের কোলে
তাতেও হয়না বলা ।
মা'র বুকে বেড়া ভাঙে তুমুল আকাশ
মা'র বুকে সমাগরা পৃথিবীর জড়ো করা গান
ছ'হাত জড়িয়ে মা
তার জন্ম জন্মান্তর খোঁজে ।

পার্টির জন্য

সুজিৎ কুমার রায়

টোনে চেপে পেন্সাম করলুম

আর লয় ।

—সখ্ আশ্রাদ সিকেয় তুললুম ।

ছামু মাসে ব্যাটার

মুখে ভাত ;

পার্টি পার্টি দিন যাবেক !

রেতে শুয়ে গায়ের লুম গুলান

ঠারো হঞ্চে যায় ।

ভাদর মাসের দিনে একটিও

ট্যাকা নাইখ !

বেহারী মাল্লব গুনা

বড় চিপস্ ।

বিপদে ট্যাকা সান্ দেয় নাকো ।

মা সাধে কি, গাল দেয়,

আমরা কেওট কিনা !

কুনো পথ নাই কো,

কি ফ্যারে পড়লুম

ব্যাটার মুখে ভাতের দিনে ?

বীরভূম জেলার পশ্চিম সীমান্ত

অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতা ।

মাটি-মাকে বিকব নাই

বরনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

ই অ'ইগ্‌গা,

জ্বিঘা জমির মালিকেই বঠি।

নামটি—

উপিনদই হভেক্‌।

ত-ই বাবা, আনখাই! এখে স্যে বইলল্য

ঠাকুর? ঘো

হামদের বাড়ীট দিতে হবেক্‌?

কে বলল; সে বিকব?

ত' জরেই লিয়ে লিবি?

উটি হভেক্‌ নাই।

না না,

‘পেলে জ্বি বিঘে প্রস্বে ও দিঘে

সমান হইবে টানা’—। ত' বইলছ,

‘তুমার বাগানটি সইর হভেক্‌।’

আর হামকে যে—

ভিটা মাটি ছাড়তে হভেক্‌—হে...

গরিব বঠি; মেনেক্‌—

লখ্‌খি ছাড়া ত লহি—

যে পেটের ল্যাগে

ভিটা মাটিট বিক্‌ই হভ!

উটি হভেক্‌ নাই,

উপাস দিব, ভখে মইরব—

মাটি-মাকে বিকব নাই।

রবি ঠাকুর? ...উ ত

জমিদারের বেটা ছিল ন,

রকত টা হামদের লো

টুকুন ভিছুই ছিল...

নাই বুঝল আঞ্জা হামদের ছুখুটা—

জমিদারকেই জিতাই দিল।

হাই মিছামিছি, কন্দি কিকির ক্যারে—

দমতক দেনা দেখাই দিয়ে

কই ল্যো ডিকরি বাইর করা'ল।

আর শালা উপিন্দ,

ল্যো—ইবার ছাড় ঘর — ॥

এখনকার দিন হালে কি আর পাইরথ ?

দখল লিতে গেইলে

রগদাই মাইরথ ন।

এখন কিসের ডর ?

পঞ্চাইৎ আছে ন ?

মু'ড়ে লিবেক্... ?

উআর বাগানটাকে সহির ক'রতে ?

অত সব লহে বাপ্

দিন পাইলটোছে

হা—ভাল,

রবি ঠাকুর লাল হাঁও

পুব দিক্‌ল্যে কেমন

চাষীর দিকেই ভাইলছে ॥

শব্দার্থ : মেনেক-কিন্ত, রকত-রক্ত, আনখাই-খামোকা, ভিছুই-
ভিন্ন, সব-সহজ, দমতক-প্রচুর, রগদাই-তাড়াকরে।

পুরুলিয়া জেলার আঞ্চলিক ভাবায় রচিত।

সম্পাদকীয়

‘সাহিত্য সৈকত’ এর শারদ সংখ্যা প্রকাশিত হল। শারদ সংখ্যা থেকেই নতুন বছর শুরু হয় এই পত্রিকার। এই শরতে ‘সাহিত্য সৈকত’ আট বছরে পা দিল। মফঃস্বল বাংলা থেকে আট বছর ধরে একটি সাহিত্য পত্রিকার নিয়মিত প্রকাশ যে কি কঠিন ব্যাপার তা অভিজ্ঞ লোকেরা জানেন। ‘সাহিত্য সৈকত’ এর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে আমাদের কিছু শুভানুধ্যায়ী ও পাঠক গোষ্ঠীর আন্তরিক পৃষ্ঠপোষনায়। তাঁদের কাছে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

‘সাহিত্য সৈকত’ এর পাঠকগোষ্ঠী যে সংখ্যায় বিরাট কিছু তা নয় তবে তার নির্দিষ্ট একটা পাঠকগোষ্ঠী আছে। এই নির্দিষ্ট পাঠকগোষ্ঠীকে আমরা সচেতন পাঠক বলেই মনে করি। পাঠকদের আমরা নীরব পাঠক হিসাবে পেতে চাইনা। তারাও তাদের সচেতন মনের মতামত নিয়ে পত্রিকার লেখক গোষ্ঠীতে এগিয়ে আসুন-এটা আমরা চাই। পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার বিভিন্ন লেখা নিয়ে আমাদের কাছে ভাল-মন্দ সমালোচনা আসে। আমরা চাই সঠিক তথ্য সহ তা’ লিখিত ভাবে আসুক।

‘সাহিত্য সৈকত’ নবীন লেখক-লেখিকাদের আত্ম-প্রকাশের প্ল্যাটফর্ম। বিনোদন নয়, সব কাজ সেরে নিয়ে কবিতা লেখা নয়, কবিতার জন্যে সব কাজ ফেলে দিয়ে যিনি আসতে প্রস্তুত “সাহিত্য সৈকত” তাঁদের স্বাগত জানাচ্ছে।

SAHITYA SANGIKAT

Oct-Dec '88

Rs. 4.00

Regd. No. 42112/81 R. N. 1

PUJA GREETINGS to all our

Customers

Members

Patrons

&

Well Wishers



fulia tangail saree bayan shilpa
samabaya samity ltd.

tangail tantujibi unnayan
samabaya samity ltd.

BAINCHA BASAKPARA, FULIA, NADIA.

Phone : Fulia 22

সম্পাদক : বাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য

প্রকাশ স্থান : দৈনিক সরণী, কলিমা, নদীয়া ৭৪১৪০২

মূল্য : মাত্র দুই টাকা

স্মৃতি
চিহ্ন

বর্ষ ৮ □ সংখ্যা ২ □ জানুয়ারি ১৯৮৯

এ সংখ্যার সৃষ্টি

শিক্ষা এসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দর কিছু উক্তি

সংকলক : কাকলি ভট্টাচার্য

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা

স্বামী নিত্যানন্দ

পৃথিবীর বুকে অঁাকা উনিশশো অষ্ট আশির ছবি

মাধব ভট্টাচার্য

কুন্তিবাস—সুজিৎ রায়

পত্র পত্রিকা আলোচনা

টুকরো খবর

কুন্তিবাস ও হরিদাস [সম্পাদকীয়]

କୃଷିବାସେଇ ଝୁଲିয়া ଜ୍ଞାନେ ସର୍ବଜନ
ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଶାଢ଼ୀ ତାର ଗରବେର ଘନ ।।

ଫୁଲିୟା ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଶାଢ଼ୀ ବୟନ ଶିଳ୍ପ
ସମବାୟ ସମିତି ଲି:



ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଉତ୍ତୁଜୀବୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ସମିତି ଲି:
ବେଂଚା ବସାକପାଡ଼ା, ଝୁଲିୟା, ବନ୍ଦୀୟା ।

ଦୂରଭାଷ—ଝୁଲିୟା ୨୨

সংসদ-এর সংস্কৃতি গ্রন্থমালা

সাহিত্যরত্ন হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

- বৈষ্ণব পদাবলী ৭৫'০০
- রামায়ণ কুস্তিভাস বিরচিত ৩০'০০

অধ্যাপক দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত

- মহাভারত কাশীরাম দাস বিরচিত (যজ্ঞশ্র)

ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত

- উপনিষদের দর্শন ২০'০০

সতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত

- উপনিষদের কথা ১০'০০

- ভক্তের কথা ১০'০০

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত রচিত

- ভারতের শক্তি-সাধনা ও

শাক্ত সাহিত্য ৩৭'৫০

অমিতা চক্রবর্তী রচিত

- সংস্কৃত নাটকেব গল্প ১০'০০

- বিশদ তালিকার দ্রষ্টব্য লিখুন ●

সাহিত্য সংসদ

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯

ফোন : ৩৫-৭৬৬৯ ও ৩৫-৩১৯৫

বক্তেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প রূপায়ণে সেচ্ছাশ্রম গ্রহণ

বক্তেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের সার্থক রূপায়ণের জন্ত জনসাধারণের অর্থ, শ্রম প্রভৃতি দেওয়ার, যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি সংস্থা প্রকল্পটির জন্ত সেচ্ছা-শ্রম দানের প্রস্তাব দিয়েছেন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের পক্ষ থেকে ঠিক করা হয়েছে যে, ২৯শে জামুয়ারী, ১৯৮৯ রবিবার থেকে প্রতি রবিবার আপাততঃ ১০০ জনের (একশত) জনের একটি দলের সেচ্ছাশ্রম গ্রহণ করা হবে।

যে সব সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করতে চান তাঁদের সরাসরি সভাপতি, বীরভূম জেলা পরিষদ, পোঃ সিউড়ি পত্র দ্বারা ইচ্ছা প্রকাশ করে যোগাযোগ করতে হবে। ঐ পত্রের ভিত্তিতে সংস্থাগুলিকে তাঁদের শ্রম দেওয়ার নির্দিষ্ট দিন জেলা পরিষদ থেকে জানানো দেওয়া হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ৪০। ৮৮-৮৯ আই. এণ্ড. সি. এ.। নদীয়া

তারিখ ৩০-১-৮৯

আমরা গড়বো বক্রেশ্বর

ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ৩৯ বছর পার হলেও ব্যর্থ পরিকল্পনা এবং অসম উন্নয়নের ফলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে জমা হচ্ছে ক্ষোভ, মাথা তুলছে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি।

এই প্রবণতা রুখতে পারে সুসম আঞ্চলিক বিকাশ। সেই লক্ষ সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিষ্ঠাসের সংকল্পে অবিচল।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প এই সংকল্পেরই প্রতীক। সপ্তম যোজনায় অনুমোদিত হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পের কাজ থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে। তবু জনগণের রক্তে ঘামে এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হবেই।

বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প কেবল মাত্র একটি বিদ্যুৎ প্রকল্প নয়, এটি পশ্চিমবাংলার মানুষের আত্মমর্যাদার প্রতীক।

সব বঞ্চনা ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে আমরা গড়বো বক্রেশ্বর এই হোক এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের সংগ্রামী শপথ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ৩৯ আই. এণ্ড. সি. এ.। নদীয়া তাং ২৭-১-৮৯

আতংকিত হয়ে মাছ খাওয়া ছাড়বেন না

মাছ নিয়ে আতংকিত হবেন না। অহেতুক আতংক ছড়াবেন না। যে ধরনের মাছে রোগ হচ্ছে তা হল : ☆ কৈ, ☆ সিঙি, ☆ মাগুর, ☆ লেটা, ☆ আড়, ☆ শাল, ☆ শোল, ☆ বোয়াল ইত্যাদি।

মাছ রান্না করে খেলে বা ভেজে খেলে তাতে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা থাকে না। পচা যে কোন খাবার খেলেই মানুষ অসুস্থ হতে পারেন।

মাছ সহ সকল পচা খাদ্য খাওয়া থেকে সকলেরই বিরত থাকা উচিত।

কৃষ্ণ মাছ খেয়ে কোন মানুষের মৃত্যু তো দূরের কথা, অসুস্থতার ঘটনাও এখনও পর্যন্ত জানা যায় নি।

● দেখে শুনে নির্ভয়ে মাছ খান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ৩৬/৮৮-৮৯ আই. এণ্ড সি. এ-।

নদীয়া, তাং ২১-১২-৮৮

কুণ্ডিলাস ভিটে

ফুলিয়ার সমৃদ্ধি কামনা



এ, টি, জুয়েলাস'

প্রোঃ শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেঘাট, নদীয়া

(মাছ বাজারের সম্মুখে)

আমাদের বিশেষত্ব—

কম দোনার গহনা

জড়োয়া অলংকার তৈরী

ডিজাইনে নতুনত্ব

গ্রহরত্নের সরবরাহকারী

- ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গয়নার কথা ভাবলেই এ, টি, জুয়েলাসের কথা ভাববেনই।

বিঃ দ্রঃ-প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে।

এক নজরে নদীয়া জেলা

আয়তন	: ৩৯২৭.০ বর্গকি: মি:
লোক সংখ্যা	: ২২,৬৪২৫৩ জন (১৯৮১ সালের আদমশুমারী অনুসারে)
পুরুষ	: ১৫,২২, ৯৩৬
স্ত্রী	: ১৪,৪১, ৩১৭
থানা	: ১৪
পৌরসভা	: ৬
বিজ্ঞপ্তি অঞ্চল	: ২
পঞ্চায়েত সমিতি	: ১৭
প্রাথমিক বিদ্যালয়	: ২৩৯৯ ●
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	: ২০১ ●
উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়	: ৫০ ●
মহাবিদ্যালয়	: ১২ ●
বিশ্ববিদ্যালয়	: ২
সরকারপোষিত গ্রন্থাগার	: ১১৫
সাক্ষরতার হার	: ৩৬.৭৭%
প্রধান কৃষিজাত দ্রব্য	: ধান, পাট, গম ইত্যাদি ।
কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প	: কাঁসা, পিতল, তাঁত, মৃৎশিল্প, শংখ, শোলা ও ডাকের সাজ ইত্যাদি ।
নদনদী	: ভাগীরথী, জলঙ্গী, চূর্ণী, মাথাভাঙ্গা, ইচ্ছামতী, ভৈরব,

সাংস্কৃতিক মঞ্চ

: কৃষ্ণনগর ও রাণাবাট রবীন্দ্রভবন,
কৃষ্ণনগর টাউনহল, কৃষ্ণনগর
পাবলিক লাইব্রেরী ময়দান মুক্ত
মঞ্চ, চাকদহ শ্রীমাতা প্রসাদ মুক্তমঞ্চ,
কল্যাণী ঋষি, অরবিন্দভবন,
শান্তিপুর পাবলিক লাইব্রেরী মঞ্চ,
উল্লা সাধারণ পাঠাগার মঞ্চ
ইত্যাদি।

বিশিষ্ট স্থান

: নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, মায়াপুর,
শান্তিপুর, শিবনিবাস, বামুনপুকুর,
ফুলিয়া, পলাশী, বেথুয়াডহরী
ইত্যাদি।

অতিথিশালা

: কৃষ্ণনগর পৌরসভার অতিথিশালা,
নদীয়া জেলা পরিষদ ডাক বাংলো
কৃষ্ণনগর, স্বরূপগঞ্জ বাংলো,
পলাশী ডাক বাংলো, বেথুয়াডহরী
বনবিভাগের অতিথিশালা ইত্যাদি।

● ডিষ্ট্রিকট হাওবুক নদীয়া : ১৯৮৬ : ডিষ্ট্রিকট স্যুটিস টি সটিক্যাল
অফিসার, নদীয়া কর্তৃক প্রকাশিত।

সাহিত্য সৈকত পত্রিকায় গত অক্টো-ডিসেম্বর '৮৮ সংখ্যায়
প্রকাশিত উল্লিখিত বিজ্ঞাপনটিতে কিছু তথ্যগত ভুল থাকায়
সংশোধিত বিবরণ জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিকের
অনুরোধে সৌজন্য বিজ্ঞাপন হিসাবে বর্তমান সংখ্যায় পাঠকবর্গের
অবগতির জন্ত প্রকাশ করা হল। সঃ সঃ সৈঃ

শান্তিপুর কো অপারেটিভ কোল্ড স্টোরেজ সোসাইটি লিমিটেড

বেলেয়ার্থ, ফুলিয়া, নদীয়া স্কোন : ফুলিয়া ৪০

এখানে যত্ন সহকারে আলু-সংরক্ষণ করা হয়। আলুব
বগুর উপর ঋণ দেওয়া হয়। সত্বর Space booking করুন।
যে কোন চাষী এখানে শেয়ার ক্রয় করতে পারেন।

সকলের সহযোগিতা প্রার্থনা করি।

বি, মহালদার

এ, পাণ্ডু

সভাপতি

চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

কেন্দ্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর (১৯৫৬) ৮
ধারা অনুযায়ী নিম্নলিখিত জ্ঞাতব্য বিষয় প্রকাশিত হইল :

- ১। প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া।
- ২। প্রকাশ কাল : ত্রৈমাসিক
- ৩। প্রকাশক : শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য
ও মুদ্রাকর : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া।
- ৪। নাগরিক : ভারতীয়
- ৫। সম্পাদক : শ্রীমাধব ভট্টাচার্য (অবৈতনিক),
সৈকত সরণী, ফুলিয়া নদীয়া।
- ৬। নাগরিক : ভারতীয়
- ৭। স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য
- ৮। মুদ্রণ : মায়ী প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।
আমি শ্রীমতী কাকলি ভট্টাচার্য এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি
যে উপরোক্ত তথ্যগুলি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মত সত্য।

স্বাঃ কাকলি ভট্টাচার্য

তারিখ—১-২-৮৯

প্রকাশক

শিক্ষা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কিছু উক্তি

● শিক্ষা হচ্ছে—মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান, তারই প্রকাশ।

● আমাদের প্রত্যেকের ভিতর—কি ক্ষুদ্র পিপীলিকা, কি স্বর্গের দেবতা সকলেরই ভিতর—অনন্ত জ্ঞানের প্রস্রবণ রয়েছে। জ্ঞান স্বতঃই বর্তমান রয়েছে, মানুষ কেবল উহা আবিষ্কার করে মাত্র। এই জ্ঞান আবার মানুষের অন্তর্নিহিত। কোন জ্ঞানই বাহির হইতে আসেনা, সবই ভিতরে।

● প্রত্যেক বিষয়ের ব্যাখ্যা তোমার নিজের ভিতরে। কেহই কখনও অপরের দ্বারা শিক্ষিত হয় নাই। প্রত্যেককেই নিজেকে নিজে শিক্ষা দিতে হইবে—বাহিরের আচার্য কেবল উদ্বোধক কারণমাত্র।

● বিদ্যাশিক্ষা কাকে বলি? বই পড়া? না, নানাবিধ জ্ঞানার্জন—তাও নয়। যে শিক্ষা দ্বারা এই ইচ্ছাশক্তির বেগ ও ক্ষুতি নিজের আয়ত্তাধীন ও সফলকাম হয়, তাহাই শিক্ষা। অত্যান্য সকল জিনিসের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির সমক্ষে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিস্ময় ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্বশক্তিমান।

● আমার মাথায় কতকগুলি বাজে ভাব ঢুকাইয়া দিবার আমার পিতার কি অধিকার আছে? আমার প্রভুর এই সব ভাব আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার কি অধিকার আছে? এসব জিনিস আমার মাথায় ঢুকাইয়া দিবার সমাজের কি অধিকার আছে? হইতে পারে ঐগুলি ভাল ভাব, কিন্তু আমার সাহিত্য সৈকত/জানু:-মার্চ '৮৯

রাস্তা উহা না হইতে পারে। লক্ষ লক্ষ নিরীহ শিশুকে এইরূপে
নষ্ট করা হইতেছে।

● উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন—স্বাধীনতা। পিতামাতার
অসঙ্গত শাসনের জন্য আমাদের ছেলেরা স্বাধীনভাবে বুদ্ধিপ্রাপ্ত
হইবার সুবিধা পায়না।

● কাহারও কল্যাণ করিতে পার—এ ধারণা ছাড়িয়া দাও।
তবে যেমন বীজকে জল, মৃত্তিকা, বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির
প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির
নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে ও নিজের
স্বভাবানুযায়ী বাড়িতে থাকে, তুমি সেইভাবে অপরের কল্যাণ
সাধন করিতে পার। কেউ কাকেও শিখাতে পারেনা।
শিক্ষক শিখাচ্ছি মনে করেই সব মাটি করে। কি জানিস,
বেদান্ত বলে, এই মানুষের ভিতরেই সব আছে। একটা ছেলের
ভিতরেও সব আছে। কেবল সেইগুলি জাগিয়ে দিতে হবে—
এই মাত্র শিক্ষকের কাজ।

● কেবল যখন মন অতিশয় শাস্ত ও স্থির থাকে, তখনই
আমাদের সুবয় শক্তিটুকু সংকার্ষে ব্যয়িত হইয়া থাকে।
আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কার্যকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী
পাঠ কর, তোমরা দেখিবে তাঁহারা অদ্বুত শাস্ত প্রকৃতির লোক
ছিলেন। কিছুতেই তাঁহাদের চিন্তের সামঞ্জস্য ভঙ্গ হইত না।
এই জন্মই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা বেশী
কাজ করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে
সর্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা
বা কোন রিপূর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা
কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া
ফেলে, এবং সে বড় কাজের লোক হয়না। কেবল শাস্ত,

ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা অধিক কার্য করিয়া থাকে ।

● যখন যে কাজ করিতে হয়, তখন তাহা একমনে একপ্রাণে সমস্ত ক্ষমতার সহিত করিতে হয়। গাজীপুরের পওহারীবাৰা ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ যেমন একমনে করিতেন, তাঁহার পিতলের ঘটটি মাজাও ঠিক তেমনি একমনে করিতেন। এমনি মাজিতেন যে, সোনার মত দেখাইত ।

● ব্রহ্মচর্যবান ব্যক্তির মস্তিষ্কে প্রবল শক্তিমহতী ইচ্ছা-শক্তি সঞ্চিত থাকে। উহা ব্যগ্ৰীত মানসিক তেজ আর কিছুতেই হইতে পারেনা। যত মহা মহা মস্তিষ্কশালী পুরুষ দেখা যায়, তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মচর্যবান ছিলেন।

● অশিক্ষিত লোক ইন্দ্রিয়সুখে উন্মত্ত ; শিক্ষিত হইতে থাকিলে সে জ্ঞানচর্চায় অধিকতর সুখ পাইতে থাকে। তখন সে বিষয় ভোগে তত সুখ পায়না। কুকুর, ব্যাঘ্র খাও পাইলে যেরূপ ক্ষুধার্তির সহিত ভোজন করিতে থাকে, কোন মানুষের পক্ষে সেরূপ ক্ষুধার্তির সহিত ভোজন সম্ভবপর নহে ।

● আমার মনে হয় শিক্ষার সার কথাই হইল মনের একাগ্রতা—কতকগুলি ঘটনার সংগ্রহ নহে ।

● প্রকৃতির সঙ্গে প্রতিনিয়ত বাস করলে তা থেকেই বথার্থ শিক্ষা পাওয়া যায়। কেবল প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারাই প্রকৃত শিক্ষালাভ হয়। আমরা সারাজীবন তর্কবিচার করিতে পারি, কিন্তু নিজে প্রত্যক্ষ অনুভব না করিলে সত্যের গণামাত্রও বুঝিতে পারিব না।

● ব্যস্ত হইও না ; অপব্যবহারকেও অনুসরণ করিতে যাইও
সাহিত্য সৈকত/জানুঃ-মার্চ

না। আমাদেরিগকে এই একটি বিশেষ বিষয় স্মরণ রাখিতে হইবে অপরের অনুকরণ সভ্যতা বা উন্নতির লক্ষণ নহে। আমি আপনাকে রাজার বেশে ভূষিত করিতে পারি—তাহাতেই কি আমি রাজা হইব? সিংহ চৰ্ম্মারত গৰ্ভত কখন সিংহ হয়না। অনুকরণ—হীন কাপুরুষের জ্ঞান অনুকরণ কখনই উন্নতির কারণ হয়না। বরং উহা মানবের ঘোর অধঃপাতের চিহ্ন। যখন মানুষ আপনাকে স্বীকাৰ করিতে আরম্ভ করে, তখন বুদ্ধিতে হঠাৎ তাহার উপর শেষ আঘাত পড়িয়াছে। যখন সে নিজ পূৰ্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুদ্ধিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন।

● অগবের নিকট ভাল যাহা পাও শিক্ষা কর, কিন্তু সেইটি লইয়া নিজেদের ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে অপরের নিকট শিক্ষা করিতে গিয়া অপরের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া নিজের স্বাভাব্য হারাইও না; এক যুহুৰ্তের জ্ঞান মনে করিও না, যদি ভারতের সকল অধিবাসী অপর জাতি-বিশেষের পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত, তাহা হইলেই ভাল হইত।

● জগতের ইতিহাসে দেখিবে, কেবল যে সকল জাতি নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীৰ্যবান হইয়াছে। প্রত্যেক জাতির ইতিহাসে ইহাও দেখিবে, যে সকল ব্যক্তি নিজের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে, তাহারাই প্রবল ও বীৰ্যবান হইয়াছে। দৃঢ়চিত্ত হও; সর্বোপরি পবিত্র ও সম্পূর্ণ অকপট হও; বিশ্বাস কর যে, তোমাদের ভবিষ্যৎ অতি গৌরবময়।

● সুখ মানুষের চরম লক্ষ্য নহে—জ্ঞান। সুখ, আনন্দ এ সকলের ত শেষ হইয়া যায়। সুখই চরম লক্ষ্য মনে করা

মানুষের ভ্রম। জগতে আমরা যত দুঃখ দেখিতে পাই, তাহার কারণ - মানুষ অজ্ঞের মত মনে করে সুখই আমাদের চরম লক্ষ্য ; কালে মানুষ বুঝিতে পারে সে সুখের দিকে নয়, জ্ঞানের দিকে ক্রমাগত চলিয়াছে—সুখ-দুঃখ উভয়েই তাহার মহান শিক্ষক—সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তদ্রূপ শিক্ষা পায়।

● জগতের মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে দুঃখ সুখ অপেক্ষা তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে—দারিদ্র্য ধন হইতে অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা হইতে নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ জ্ঞানাগ্নির প্রস্ফুরণে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।

● ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাত্ম হইতে এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্বশক্তিমতী? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও অধিক উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন-চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্বলতা নহে।

● জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত ‘আমি’ কে—সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ ‘আমি’ কে প্রকাশ কর—প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর।

● আজকালকার শিক্ষাপদ্ধতি মানুষকে গড়িয়া তুলেনা, কেবল উহা গড়া জিনিস ভাঙ্গিয়া দিতে জানে। এইরূপ অবস্থামূলক বা অস্থিরতা বিধায়ক শিক্ষা কিংবা যে শিক্ষা কেবল ‘নেতি’—ভাবই প্রবর্তিত করায়, সে শিক্ষা মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর।

মস্তিষ্কের মধ্যে নাম। বিষয়ের বহু বহু ওষ্য বোঝাই করিয়া,
সেগুলিকে অপরিণত অবস্থায় সেখানে সারাজীবন হট্টগোল
বাধাইতে দেওয়াকেই শিক্ষা করা বলা চলেনা। সং আদর্শ ও
ভাবগুলিকে এমন ভাবে সুপরিণামলাভ করাইতে হইবে,
যাহাতে তাহারা প্রকৃত মনুষ্যত্ব, প্রকৃত চরিত্র ও জীবন গঠন
করিতে পারে।

● ন্যায় বিজ্ঞান কতকগুলি মুখস্থ করিলেই শিক্ষা হয়না।
বাহ্য জীবনের সঙ্গে মিশিয়া যায়, তাহাই বথার্থ শিক্ষা।

● আমাদের দেশের পক্ষে এক্ষণে প্রয়োজন—লৌহবৎ দৃঢ়
মাংসপেশী ও স্নায়ুসম্পন্ন হওয়া—এমন দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন
হওয়া যে, কেহই যেন উহার প্রতিরোধে সমর্থ না হয়, যেন
উহা ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় রহস্যভেদে সমর্থ হয়, যদিও এই
কার্যসাধনে সমুদ্রের অতল তলে যাইতে হয় যদিও সর্বদা
সর্বপ্রকার মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত থাকিতে হয়!
ইহাই এক্ষণে আমাদের আবশ্যক।

● নিজেদের সংকীর্ণ গর্ত হইতে বাহিরে আসিয়া দেখ, সব
জাতি কেমন উন্নতির পথে চলিয়াছে! আর তোর কি কচ্ছিস!
এত বিদ্যা শিখে পরের দোরে ভিখারীর মত ‘চাকরি দাও’ ‘চাকরি
দাও’ বলে চেষ্টাচ্ছিস। জুতো খেয়ে খেয়ে—দাসত্ব করে করে তোর।
কি আর মানুষ আছিস! তোদের মূল্য এক কানাকড়িও নয়।
এমন সজলা সফলা দেশ, যেখানে প্রকৃতি অস্ত্র সকল দেশের
চেয়ে কোটীগুণে ধনধান্য প্রসব করেছেন, সেখানে দেহধারণ
করে তোদের পেটে অন্ন নেই—পিঠে কাপড় নেই। যে দেশের
ধনধান্য পৃথিবীর অপর সকল দেশে civilisation (সভ্যতা)
বিস্তার করেছে, সেই অন্নপূর্ণার দেশে তোদের এমন ছর্দশা ?

● সম্প্রসারণই জীবন—সঙ্কীর্ণতাই মৃত্যু; প্রেমই জীবন

দেখই মৃত্যু। আমরা যেদিন হইতে অপর জ্ঞাতি সকলকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলাম, সেইদিন হইতে আমাদের মৃত্যু আরম্ভ হইল। আর যতদিন না আমরা আবার সম্প্রসারণশীল হইগেছি—ততদিন কিছুই আমাদের মৃত্যু আটকাইয়া রাখিতে পারিবে না। অতএব আমরাদিগকে পৃথিবীর সকল জাতির সহিত মিশিতে হইবে।

● মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐগুলি দিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে উহা হইতে মহৎ মহৎ কার্য হইবে।

● এ দেশের এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা, এতে শতকরা বড় জোর একজন কি দুইজন দেশের লোক শিক্ষা পাচ্ছে। যারা পাচ্ছে—তারাও দেশের হিতের জন্য কিছু করে উঠতে পারছে না।

● কতকগুলি পরের কথা ভাষান্তরে মুখস্থ করে মাথার ভিতরে পুরে পাশ করে ভাবাচ্ছ—আমরা শিক্ষিত। হ্যাঃ! হ্যাঃ! এর নাম আবার শিক্ষা! তোদের শিক্ষার উদ্দেশ্য কি? হয় কেরানীগিরি; না হয় একটা ছুঁই উকীল হওয়া, না হয় বড় জোর কেরানীগিরিরই রূপান্তর একটা ডেপুটিগিরি চাকরী এইত! এতে তোদের বা কি হল, আর দেশেরই বা কি হল? একবার চোখ খুলে দেখ, স্বর্ণপ্রসূ ভারতভূমিতে অম্মের জন্য কি হাহাকারটা উঠেছে! তোদেরই ঐ শিক্ষায় সে অভাব পূর্ণ হবে কি? কখনও নয়।

সংকলক : কাকলি ভট্টাচার্য

আকর : শিক্ষা প্রসঙ্গে—বিবেকানন্দ

শিক্ষার অগ্ৰতম উদ্দেশ্য-চরিত্র গঠন করা

স্বামী নিত্যানন্দ

[রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন সেবামূলক কাজকর্মের মধ্যে মানুষ গড়ার কাজ অর্থাৎ শিক্ষাদানের কাজই হচ্ছে প্রধান। এ রাজ্যে অগ্রাগ্র সরকারী বেসরকারী ও মিশনারী প্রতিষ্ঠানের তুলনায় রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ফলাফল প্রশংসনীয়।

“রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষাদানে ছাত্রদের উপর স্বামী বিবেকানন্দর শিক্ষাদর্শের প্রভাব” এই বিষয়ের ওপর আমরা গত সংখ্যা “সাহিত্য সৈকত” এ রামকৃষ্ণ মিশন বয়েজ হোম, রহড়ার প্রধান শিক্ষক স্বামী জয়ানন্দ মহারাজ এবং পুরুলিয়ার রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের সেক্রেটারী স্বামী উমানন্দ মহারাজের দু’টি সাক্ষাৎকার ছেপেছিলাম। বর্তমান সংখ্যায় ব্যারাকপুরে অবস্থিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী নিত্যানন্দ মহারাজের সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হল। স্বামী নিত্যানন্দ সম্প্রতি বিদেশ গিয়েছিলেন। যে ক’টি দেশ তিনি ঘুরে এসেছেন, সে সকল দেশের শিক্ষাদান প্রসঙ্গেও তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। —সম্পাদক]

স্বামীজির শিক্ষাদর্শ শুধু যে রামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোতেই যে সমস্ত ছাত্র পড়ে তাদেরকেই প্রভাবিত করছে এমন নয়। স্বামীজির শিক্ষাদর্শ একটা জাতি গঠনের জন্য, দেশ গঠনের জন্য এবং সমস্ত দেশকে একত্র করে একটি বিশ্বমানব প্রতিষ্ঠার জন্য।

স্বামীজির শিক্ষাচিন্তার মূল কথাটিই হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষকেই দৈবশক্তি সম্পন্ন হতে হবে। Each soul is potentially divine.

স্বামীজি শিক্ষা ও ধর্মের কথা বলতে গিয়ে এই কথাটিকেই আবার দুই ভাবে বলেছেন। —শিক্ষা হচ্ছে—*manifestation of perfection already within man*’ এবং ধর্ম হচ্ছে *manifestation of divinity already within man*. এখানে *perfection* এবং *divinity* এই দুটি শব্দ তিনি ব্যবহার করেছেন কিন্তু পরিপূর্ণ ভাবে যিনি শিক্ষালাভ করেছেন তার ভিতরে দৈবগতির ক্ষুরণ হয়েছে আবার পরিপূর্ণ ভাবে যার ভিতরে দৈবগতির বিকাশ ঘটেছে সাধারণভাবে শিক্ষিত না হলেও, স্কুল কলেজের ডিগ্রি না থাকলেও তিনি যথার্থভাবে শিক্ষক এবং শিক্ষিত জ্ঞানী লোক। এই যে তত্ত্বটি এব প্রমাণ আমাদের দেশে বহু পাওয়া যাবে।

স্বামীজির শিক্ষাদর্শ মিশন প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্রদের কতটা প্রভাবিত করছে এই প্রসঙ্গটা আলোচনা করলে অল্প সমস্ত জায়গা থেকে মিশনের স্কুলে যে সমস্ত ছাত্ররা পড়ে তাদেরকে একটু পৃথক করা হয়। যদিও এটা অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষে এবং ভারতবর্ষের বাইরে পশ্চিমবঙ্গ তো বটেই বিভিন্ন জায়গায় অনেক ভক্ত অনেক সমিতি অনেক প্রতিষ্ঠান তারা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এবং স্বামী বিবেকানন্দর আদর্শকে অবলম্বন করে অনেক জনহিতকর প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয় ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গ আলোচনা করতে হলে মিশন প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বামীজির শিক্ষাদর্শ কতটা প্রভাবিত করছে এতে অন্য ছাত্রদের থেকে এই ছাত্রদের একটু *isolate* করে চিন্তা করতে হচ্ছে।

আগি পূর্বে রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত একটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন ছিলাম এবং বর্তমানে ব্যারাকপুবেও এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দশ বছর অতিক্রম করল। ব্যক্তিগত ভাবে আমার কাজকর্ম হুঃস্থ অনাথ দীন হুঃখী অনাথ ছেলে-মেয়েদের নিয়ে। তথাপি তাদের সঙ্গে আরও অন্যান্য ছেলেরা রয়েছে।

এখানে ধনী নির্ধন দরিদ্র বাম হরিজন হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান একত্র হয়ে আছে যাতে নাকি একটি নিউক্লিয়াস গঠন হতে পারে—a classless society—যা স্বামীজির পরবর্তী যুগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বামীজির চিন্তাধারা পরবর্তীকালে গান্ধীজী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে বিভিন্নভাবে আমাদের মধ্যে এসেছে। এবং তাকে অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠেছে।

কিন্তু স্বামীজির শিক্ষাচিন্তা রামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে যুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যে সব ছাত্র পড়ে তাদের বুদ্ধিতে সেই শিক্ষা চিন্তা অবশ্যই অগ্ৰাণ্ড ছেলেদের চেয়ে বেশি। তার কারণ হচ্ছে, যেমন আমাদের এখানে বা মিশনের অন্যান্য স্কুলে, যেখানে কে জি থেকে আছে, কে জি থেকে ক্লাশ টেন পর্যন্ত-বিবেকানন্দর জীবন, গল্প, ঠাকুর রামকৃষ্ণের গল্প, মায়ের কথা, স্বামীজির আহ্বান, যুব সম্প্রদায়ের প্রতি স্বামীজি যা বলেছিলেন, শিক্ষা বাবস্থা, দেশপ্রেম এবং ধর্ম সম্বন্ধে যে সব কথা বলেছিলেন সেই সব ভিন্ন ভিন্ন পর্যায়ে ছোট ছোট পুস্তকাকারে ছাপিয়ে তাদেরকে পড়ানো হয় এবং স্বাভাবিক ভাবেই মিশন প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত ছাত্ররা পড়ে অন্যান্য ছাত্রদের চেয়ে তারা একটু বেশি ওয়া কিবহাল এটা বলা যায়। তবে এইসব ছাত্রদের ওপরই যে স্বামীজির শিক্ষা চিন্তা, মানব প্রেম দেশ প্রেমের আদর্শ বেশি করে পড়ে তা চিন্তা করলে চলবে না। চলবেনা এই কারণে যে স্বামীজির আদর্শে উদ্ভূত হয়ে সর্বস্ব ত্যাগ করে মানব কল্যাণে ঝুঁপিয়ে পড়েছে অথবা বৈরাগ্য অবলম্বন করে ঈশ্বরলাভের জন্য বেরিয়ে পড়েছে এই রকম লোকের সংখ্যা ঠিক মিশন স্কুলে পড়া ছাত্রদের মধ্যে যে বেশি তা নয়। বরং দেখা যায়, স্বামীজির এই যারা বেশি পড়েছেন, স্বামীজি, নেতাজী, গান্ধীজী সম্বন্ধে যারা বেশি বক্তৃতা শুনেছেন, বই পড়েছেন, শৈশব থেকেই হয়ত বাইরে থেকে যোগাযোগ ছিল সেই সব প্রতিষ্ঠানে পরবর্তীকালে মিশনে সন্ন্যাসী হিসাবে যোগ

দিয়েছেন অথবা ব্যক্তিগত জীবনে তারা সংসার করলেও ছোট খাট কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তারা স্বামীজির শিক্ষাদর্শ বা ধর্মচিন্তাব প্রদীপটি জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। —একটা জিনিস, যেটা নাকি স্বামীজি আমাদের যুব সমাজকে আহ্বান কবে বলেছিলেন যে, তোমার নিজের জীবনের গণ্ডীর বাইরে যেতে হবে তোমাকে নিজেকে মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য।

মানব জীবনের আদর্শ হচ্ছে এগিয়ে চলা। চড়েবেতি। এখন মানুষ হয়ে জন্মেছি, দেবতা হয়ে অমর হয়ে থাকব এইরকম একটা আদর্শ আমরা ছেলেদের মনে দেবার চেষ্টা করি। শ্রীরামকৃষ্ণ নামের সঙ্গে যুক্ত যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে এবং যেখানে ছেলেরা পড়াশুনা করে বা মেয়েরা পড়াশুনা কবে সেখানে একটি আদর্শ জীবন গড়ে তোলার একটা ছাঁচ আছে। এবং যে সমস্ত ছাত্রদের মধ্যে সংস্কার আছে তারা যেখানে যোগদান করে, বাস্তবিকই কিছু ছেলে, কিছু ছাত্র স্ননাগরিক হয়ে গড়ে ওঠে। আমাদেরকে অনেক প্রশ্ন করে এই যে আপনারা দুঃস্থ অনাথ ছেলেদের এইভাবে সেবা করছেন তারা পববতীকালে দেশে অন্যান্য দুঃস্থ ছেলে, গরীব ছেলে তাদের কতটা দেখে? আমি তাঁদের ঠিক উত্তর দিতে পারিনা যে তারা বাস্তবিকই কতটা দেখে! তবে এটা দেখি, তারা যখন আসে বা আমরা যোগাযোগ করি তখন বুঝি তারা অত্যন্ত স্ননাগরিক হয়ে উঠেছে। আমরা নাগরিকের কতকগুলি কোয়ালিফিকেশন বলে থাকি এবং ছাত্রদের জীবনকে কেন্দ্র করে স্বামীজি জীবনকে উৎসর্গ করে কতকগুলো ঘটনার উল্লেখ করি যেখানে সত্যের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করা যায় কিন্তু কোন কিছুব জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা যায়না। জীবনে যদি দুঃখ পেতে হয়, নিজের দিক থেকে হোক তবু বাবা মাকে সুখী কব নিজের স্বার্থের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে মানুষের কল্যাণ চিন্তা করা নিজের পরিবারের পরিধিকে বিস্তৃত করে সমস্ত দেশকে সমস্ত বিশ্বাসকে আপন করে নেওয়া এবং শুধু মানুষ

নয়, প্রাণী জগতের, উদ্ভিদ জগতের এই যে বৃক্ষলতা পশুপাখী এদের ভালবাসা—যাদের মধ্যে এই সংস্কার আছে আধার আছে তারা তা নিতে পারে এবং পরবর্তী কালে কার্যে পরিণত করতে পারে। এখানে ছেলেদের একটা নির্দিষ্ট গভীর মধ্যে পড়াশুনা করতে হয়। বাড়ীতে যেমনি একটি ছেলে ঘুম পেলে ঘুমিয়ে যায়, ক্ষিদে পেলে খেতে পায় কিন্তু এখানে জীবনটা ঘন্টার সঙ্গে বাঁধা। এখানে ঘুম না পেলেও ঘটা পড়লে ঘুমিয়ে পড়তে হয় আবার ঘুম না ভাললেও ঘটা পড়লে উঠে পড়তে হয়, ক্ষিদে পেলেও খাওয়ার উপায় নেই ঘটা না পড়া পর্যন্ত। এই যে ঘন্টার সঙ্গে বাঁধা জীবন এর যেমন একটা ভাল দিক আছে আবার একটা খারাপ দিকও আছে।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে স্কুলের সংখ্যা বেশি, কলেজের সংখ্যা কম, বর্তমানে যে আবহাওয়া বাইরে আছে, তাতে আমরা যখন ছেলেদের শেখালাম পিতৃদেব ভব বা মাতৃদেব ভব বা তোমার ভিতরে অমিত শক্তি অমিত বন, বর্ষে বর্ষবান স্বামীজি যে কথাটা খুব বেশি করে বলতেন যে ছাত্রদের “অভী” মন্ত্রে দীক্ষিত কর। তিনি বলতেন সমস্ত কথায় সারমর্ম যদি আমাকে এক কথায় ব্যক্ত করতে হয় তাহলে আমি তা বলব—‘অভী’। আমরা ছাত্রদের যখন এই “অভী” কথাটা বলি বা শেখাই তখন ছাত্ররা অনেক ক্ষেত্রেই তা গ্রহণ করে কিন্তু বাইরে গিয়ে কখনও কখনও তা উল্টোদিকে এমন ভাবে প্রাবৃত হয় যে তাতে তার ক্ষতিও করে অনেক সময়।

স্বামীজির শিক্ষাদর্শ যতটা আমরা দিতে চাই বা দিতে আশা করি নেটা যে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেরা বেশি করে গ্রহণ করতে পারছে, আমি আগেই বলেছি যে, তা আমার মনে হয়না। খাবাও বা যতটুকু গ্রহণ করতে পারছে, এখানে বাইরে যখন উচ্চ শিক্ষায় যাচ্ছে সেহেতু আমাদের অধীনে কলেজের সংখ্যা কম (পঃ বঙ্গে মাত্র ৩টি) এবং বিশ্ববিদ্যালয় তো নেই-ই সেই জন্য এখান থেকে যতটুকু তারা শিখে গেল

পববর্তীকালে যে চিন্তাধারার স্রোতে গিয়ে পড়লো তাতে অনেকেই এটা হারিয়ে ফেলে বলে আমার ইদানী' কালে ধারণা হচ্ছে।

আমরা যখন শেখাই পিতৃদেব ভব মাতৃদেব ভব, স্বামীজি এর সঙ্গে যোগ করে দিলেন—দরিদ্র দেব ভব, মূর্থদেব ভব চণ্ডালদেব ভব। আমরা যখন শেখাই তোমার জীবনে মা হচ্ছেন প্রথম পূজনীয়া, তারপর বাবা তারপর ভগবান। এবং সেই ভগবানও কিন্তু আবার মন্দির মসজিদের চেয়ে মানুষের মধ্যে তার প্রকাশ বেশি। সুতরাং মানুষকে তুমি ভালবাস, মানুষের দুঃখ কষ্ট তুমি অনুভব কর, মানুষের আনন্দে সুখী হও দুঃখে বাথিত হও, তার কাছে গিয়ে দাঁড়াও আপন বলে তোমার সংসারের গণ্ডীর বাইরে গিয়ে—এসব কথা আমরা শিখিয়ে দিই। এখানে যতদিন থাকে দেখি ভালই থাকে কিন্তু পরবর্তী কালে বাইরের ঝড় ঝঞ্ঝার মধ্যে এই আদর্শের প্রদীপটি অনেকেই ধরে রাখতে পারেনা বলে আমার ধারণা। তথাপি একথা অনস্বীকার্য এটা চোখের সামনে খুব ভালই দেখতে পাই এবং বাইরেও যারা দেখেন এদের কথাবার্তা আচার আচরণে কিছুটা সংযত ভাব থাকে। আর্ন্ত মানুষের সেবায় এরা এগিয়ে আসে। তবে আশাহীনরূপ আসছেন। বর্তমান যুগে এমন একটা অশু আবহাওয়া এসে এমন ভাবে বিঘাঙ্ক করে দিচ্ছে—যাতে সব কিছুর মধ্যেই যেন একটা জেহাদ ঘোষণার প্রবণতা। ছাত্র তৈরী করার জ্ঞান মিশন প্রতিষ্ঠানে যে জাতীয় সম্যাসী শিক্ষক আগে ছিলেন যাদের জীবন ত্যাগের প্রতিশ্রুতি, যাদের জীবনে শিক্ষার সঙ্গে আধ্যাত্মিকতা জড়িত ছিল খুব বেশি, মিশন প্রতিষ্ঠান গুলোতে সেই জাতীয় শিক্ষকের এখন অভাব। তার কারণ হচ্ছে সংখ্যায় অনেক প্রতিষ্ঠান, আয়তনে তা অনেক বড়, এবং সম্যাসীদের সংখ্যা, যারা নাকি ত্যাগ ও সেবামস্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সংসার ছেড়ে এসেছেন মানব সেবার মাধ্যমে ভগবান লাভ করবেন বলে তাঁদের সংখ্যাও

এখন খুব কমে গেছে। সুতরাং আমাদের বিজ্ঞাপন দিবে বাইরের থেকে বেতন দিয়ে শিক্ষক রাখতে হয়। একজন বেতন-ভাগী শিক্ষক, স্বভাবতই তাঁর চেষ্টা থাকবে কি করে বেশি রোজগার করা যায়। সব শিক্ষকই যে আবার আদর্শহীন তা আমি বলব না তবে একজন সন্ন্যাসী শিক্ষক, যিনি তাঁর সর্বস্ব তাগ করছেন তাঁর পেছনে কোন টান নেই, জীবনের লক্ষ্য সামনের দিকে। শুধু মানুষের কল্যাণ এবং সেই কল্যাণের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর লাভ। সেইরকম আদর্শে উদ্বুদ্ধ শিক্ষকের সংখ্যা কম। বিদ্যালয়গুলোতে দেখা যায় একজন শিক্ষকের প্রভাব একটি ছাত্রের ওপর যতটা বেশি অন্যলোকের প্রভাব ততটা পড়েনা।

তথাপি আমরা যখন এইসব বইগুলো কমপলসরি পাঠ্য করে দিয়েছি, সেগুলো পড়াতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে শিক্ষকরাও নতুন নতুন আলোর সন্ধান পেয়েছেন এবং শিক্ষকদের মধ্যেও কখনও কখনও কেউ কেউ সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন আবার সংসারে থেকেও কেউ কেউ ভালভাবে পড়াবার চেষ্টা করেন তবে সংখ্যা খুব কম।

স্বামীজি যে চরিত্র গঠনের শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন—**man making, character building education**—এই জিনিস-গুলো মুখে বলা যত সহজ কাজে পরিণত করা খুব কষ্টসাধ্য। বক্তৃতাতে এ জিনিস বোঝানো যাবে না, এটি জীবন দিয়ে দেখাতে হয়। এই যে **character making**—শিক্ষার অন্ত্যতম উদ্দেশ্য—চরিত্র গঠন করা, **man making**—মানুষ তৈরী করা। এই যে শরীরের পুষ্টি সাধন করা—উপনিষদেও কথা স্বামীজি বলতেন—এই আত্মা, বলহীনেন লেহু। তুমি যদি দুর্বল হও তা হলে আত্মজ্ঞানও লাভ করতে পারবে না যেটা নাকি মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই জন্ম তিনি কিছুটা ঠাট্টা করেই বলেছিলেন—গীতা পাঠ পরে—ফুটবল

খেলানো দরকার আগে। তিনি বলতেন শঙ্করের মেধা, অর্থাৎ হিন্দুর মেধা থাকবে একটা মুসলমানের হৃষ্টপুষ্টি শরীরের মেধা।

এই রকম কথা তিনি চিন্তা করেছিলেন। সেই সব শিক্ষা আমরা ছেলেদের দেবাব চেষ্টি করি এবং ছেলেদের মধ্যে সেই ছাঁচটা আমাদের প্রতিষ্ঠানে যতক্ষণ থাকে কিছুটা যে পড়েনা তা নয় পড়েই। আমরা নৈরাশ্রবাদী নই, আশাবাদী! প্রতিষ্ঠানের আয়তন বড় হয়ে গেছে, ত্যাগও সেবাব্রতে দীক্ষিত সন্ন্যাসী শিক্ষকের সংখ্যা কমে গেছে এবং বাইরের আবহাওয়া এত কলুষিত হয়ে গেছে যে সামান্য একটা খেলাকে কেন্দ্র করে পর্যন্ত সাংঘাতিক মাঝামাঝি হয়ে যাচ্ছে একটি ছাত্র আর একটি ছাত্রকে আঘাত করতে কুঠাবোধ করছেন। মাঝে মধ্যে এমন সব সংবাদ সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হতেও দেখি যা চিন্তাও করা যায়না যে একটি ছাত্র আর একটি ছাত্রকে খুন কবেছে। যে জিনিসটা ভাল তার শক্তি অনেক কিন্তু মাঝে মধ্যে আত্মরিক শক্তি এসে তাকে পরাস্ত করে ফেলে। দেবাসুরের যে সংগ্রাম এটাই মানুষের জীবন। এই সংগ্রাম ভেতরে ভেতরে সব সময় চলছে। আমাদের কাছ থেকে পাশ করে ছেলেরা যখন বাইরে যায় তারা কলেজ বা পরবর্তী কালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যায় আমি সব জায়গার কথা বলতে পারবনা পশ্চিমবঙ্গের কথা বলতে পারি, যে আবহাওয়ার সঙ্গে তারা পরিচিত হয় তাতেই conscious হয়ে যায়—যে আবহাওয়ার মধ্যে তারা বড় হয়ে এল, যে সব কথা শুনে এল পরবর্তীকালে সে সব কথা তো শুনছেইনা বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তার আবার বিরোধও হচ্ছে—এই অবস্থার মধ্যে পড়ে শৈশবের যে চিন্তা-ধারাটা প্রভাবিত করেছিল তাদের জীবনকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা মুছে গেল, আবার দেখা যায় তারা যখন সংসার জীবনে প্রবিষ্ট হল, সম্ভানাদি হয়েছে তখন কিন্তু এর বিরুদ্ধে আবার অনেকে অনুভব করে। তখন তাদের অনুভূত হয় **they had a better education** এবং সেই শিক্ষাটা তাদের সাহিত্য সৈকত/জাহ্নু-মাঠ

ছেলেমেয়েদেরও দিতে চায় বলে আমাদের কাছে এরকম অনেকই আসে !

বর্তমানে যে সমস্যাটা,—ছেলেদের উপরে যে প্রভাব পড়ছে না তা নয়, প্রভাব খুবই পড়ছে। যে কোন মিশনের ছেলে কে এটা জিজ্ঞেস করলে—স্বামীজির আদর্শের সম্বন্ধে তু' চারটি কথা সে বলে দেবে। কারণ তারা আবৃত্তি করে অনেক সময় বলে ঈশ্বরের জন্তু তোমরা অন্বেষণ করিতেছ এই সব দীন-তুঃখী দুর্বল, অনাথ তুঃস্থ এরা কি তোমার ঈশ্বর নহে? তবে তাদের পূজা কর না কেন? যদি ঈশ্বরের জন্য একটা মন্দিরের দরকার হয় তবে দেহরূপ মন্দির তো রয়েছে। যদি প্রতিমাব দরকার হয় তবে আত্মাইতো রয়েছে। Human soul in human body. why not worship it first? এই সব কথা আমাদের ছেলেরা জানে। যে কোন মিশনের ছেলেবা এ সব জানে। সাধু সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে এবং মিশনের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের ভেতরে দিয়ে এই সব কথা তাদের জানা হয়। শৈশবকালে তাদের মনের মধ্যে এ সবের একটা ছাপ নিশ্চয় পড়ে! আগে ছেলেরা কলেজে গিয়েও এই ছাপ যতটা maintain করতে পারতো এখন তা পারছে না। পারছেন না তার একটা প্রমাণ আগে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠানে থেকে শিক্ষিত হয়ে রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে বা এই জাতীয় সেবা প্রতিষ্ঠানে ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সন্ন্যাস জীবন যাপনের জন্য যোগদান করত। এখন তা তুলনামূলক ভাবে কমে গেছে। এই কমে যাওয়ার কারণটা হচ্ছে আজকে ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির একটা বিবোধ সৃষ্টি কবা হয়েছে যদিও আসলে তার বিবোধ নেই।

মানুষের ভেতরে যে দৈবশক্তি আছে এবং তাকে ক্ষুরণ করার জন্তু যে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা দরকার ধর্মাচারণ দরকার সেই জিনিসটা আগে যে রকম ছাত্ররা শুনত এখন তা শুনছেই না বরঞ্চ কিছুটা উণ্টো শুনছে।

ধর্মসম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল ধারণা আছে। স্বামীজি যে ধর্মের কথা বলে গেছেন সেই ধর্মের কেন্দ্র বিন্দুতে কোন দেবতা নেই, কোন মন্দির নেই, তার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে মানুষ। স্বামীজি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় একথা বারবার বলেছেন যে, মন্দিরের যে দেবতা, তার সম্বন্ধে আমাদের ধারণা—তিনি হচ্ছেন সর্বঙ্গ এবং সর্বশক্তিমান। তিনি আবার দয়ালু। স্বামীজি প্রস্তাব করেছেন তাই যদি হবে তবে তিনি তো মানুষের দুঃখ কষ্ট নিজেই জ্ঞানেন, তাকে বলতে হবে কেন—সর্বঙ্গ যখন। সর্বশক্তিমান, তিনি ইচ্ছা করলেই কিছু করতে পারেন। তিনি আবার দয়ালু। তার দয়ার প্রমাণ হিসাবেই এ করা দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, এত মন্দির আছে এত দেবতা আছে, এত মসজিদ আছে, এত চার্চ আছে তা সত্ত্বেও কিন্তু মানুষের দুঃখ কষ্টের সীমা নেই। সুতরাং স্বামীজি বলতেন—আমাদের এখন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে হবে। আমরা ঈশ্বরকে অস্বীকার করছি না, ঈশ্বর হচ্ছেন পরম পিতা। আমরা সাংসারিক জীবনে দেখি পিতাকে তুষ্ট করতে হলে, মাতাকে তুষ্ট করতে হলে ছেলেকেই আগে দেখ, ছেলের তুষ্টিতেই মাতার তুষ্টি, ছেলের তুষ্টিতেই পিতার সন্তুষ্টি, সুতরাং মানুষকে আগে সেবা কর। স্বামীজি এক জায়গায় তাঁর এক শিষ্যকে বলেছেন—নিজের কল্যাণের জন্য চিন্তা করে তুই জাহান্নামে যাবি, অপরের মুক্তির জন্ত চেষ্টা কর। —এই যে আদর্শের কথাগুলো এগুলো মিশন প্রতিষ্ঠানের যে কোন ছাত্র বা ছাত্রী জানে এবং এটা চিন্তা করে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে এটাকে উন্নত করার মত পরিবেশ খুঁজে পায়না। তার একটা কারণ আছে। সকলের বাড়ির পরিবেশটাও কিন্তু অনুকূল নয়। কারণ সামগ্রিক ভাবে দেশের যে চিন্তাধারা চলছে সেটাত বাড়িতেও প্রতিফলিত হচ্ছে। একটি ছেলের উপর তার বাবা-মা দিদি এবং বাড়ির সকলেরই প্রভাব পড়ছে আগে। পরে শিক্ষকের। সুতরাং আমাদের যে চেষ্টা সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেছে তা

বলবন। কিন্তু আগের তুলনায় ততটা সফল হচ্ছে না। তাব
 কারণগুলো আমি বিশ্লেষণ করেছি। যেমন মিশন শিক্ষা
 প্রতিষ্ঠানগুলো আয়তনে বড় হয়ে গেছে অনেক ছাত্র হয়ে
 গেছে এবং সেখানে শিক্ষক-ছাত্রের যে সম্পর্ক যে সম্পর্কের ফলে
 একটি জীবনকে mould করা তো—স্বামীজি বলেছেন যে,
 বীর্ঘবান হও, শক্তিমান হও, অভী মস্ত্রে দীক্ষিত হও, শ্রদ্ধাবান
 হও এবং পরহিতে জীবনপাত কর এই আমার ইচ্ছা এবং
 আশীর্বাদ। এই যে শ্রদ্ধাবান হও, বীর্ঘবান হও পরহিতে
 জীবনপাত কর এই কথাগুলো আমরা যতই শিখিয়ে দিই না
 কেন একে যে লালন পালন করতে হবে, —একটি বীজ
 পুঁতলেই তো আর ফল হবেনা, বীজ পুঁতে তাকে জল দিতে
 হবে, সার দিতে হবে আলো দিতে হবে, বাতাস দিতে হবে
 গরু ছাগলের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তাকে। এবং সেই
 রক্ষা করার যে দায়িত্ব সেটা কিন্তু বাড়ির আত্মীয় স্বজন এবং
 পিতা মাতার দায়িত্ব। পরবর্তীকালে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে
 যাচ্ছে সেখানকার দায়িত্ব, যেহেতু একটি ছেলে কোন মিশন
 প্রতিষ্ঠানে একেবারে ক্লাশ ওয়ান থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত
 পড়াশুনো করছেন—অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্কুলের পড়াশুনো
 শেষ করে যাচ্ছে, তখনও তার maturity আসেনি। যখন
 সে matured হল তখন অল্প এক ভাবধারা তার জীবনে
 এমন এক সংঘাত নিয়ে আসে এমন একটা ধাক্কা নিয়ে আসে
 এবং সেই জিনিসটা এত সহজে তাকে উন্টোদিকে নিয়ে যায়।
 আমরা যে এতদিন শিক্ষা দিয়ে দিলাম তা ধরে রাখতে অনেক
 ক্ষেত্রে অনেকেই সক্ষম হয়না। আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন শিক্ষকেরও
 অভাব। আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন যে শিক্ষক তাঁরাই কিন্তু
 সন্ন্যাসী শিক্ষক হওয়ার উপযুক্ত এবং তাঁদের ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে
 যারা আছে সেই সব ছাত্র কিন্তু পরবর্তী কালে হয় সন্ন্যাসী
 হয়ে যায় আর না হয় সংসারে প্রতিষ্ঠিত হয়েও তারা অপরের
 কথা ভাবে, দেশের কথা চিন্তা করে, নিজের উন্নতি নিজের

সুখের সঙ্গে সঙ্গে আবেগ অগ্র দশজনের কি করে উন্নতি ও
সুখশান্তি হবে সেই কথা চিন্তা করে। এই কথাটা ঠিক যে
আমাদের মিশন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা লাভ করে তারা তাদের
পরবর্তী জীবনে নিজ নিজ এলাকায় সেই শিক্ষা কিছু কিছু কার্যে
পরিণত করার চেষ্টা করে।

আমরা একেবারে নিরাশ নই তবে একে পরিপূর্ণ ভাবে
রূপ দিতে গেলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর আয়তন ছোট করতে
হবে, সর্বতোভাবেই রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে মুক্ত করতে
হবে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে ইচ্ছা করলেও
কিন্তু নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী চালানো যাচ্ছেনা। কতগুলো
সিলেবাস আছে যা ফলো করতেই হয় এবং এমন কিছু নিয়ম
কানুন মেনে চলতে হয় যার মধ্য দিয়ে এই আদর্শটাকে বাস্তবে
রূপদান করা কঠিন হবে পড়ে। স্বামীজির শিক্ষাচিন্তা
দেশপ্রেমের কথা ধর্মাদর্শ এ সব কথা ছাত্ররা শুনে ঠিকই তবে
তারা এটাও ভাবে যে এ সব পড়ে ত পরীক্ষায় বেশি নম্বর
পাওয়া যাবেনা। এটা যেমন আছে তেমনি তাদের মনের
সর্বজনীন উন্নতির দকটাও আছে। আমরা বলে থাকি তোমার
ইচ্ছাশক্তি, অনুভব শক্তি, বুদ্ধিশক্তি, শারীরিক শক্তি সবদিক
থেকে তুমি যে একজন পূর্ণ মানুষ তা হয়ে উঠতে হবে।

একটা তুলনামূলক আলোচনা যদি করা যায় তাহলে
দেখা যাবে স্বামীজির শিক্ষাদর্শের কথা মিশনের ছেলেরা
বেশি জানে। এই জানে বলেই যে তাদের জীবনে
তা প্রতিফলিত তা আমি বলব না। অন্ততঃ বর্তমানে তা দেখা
যাচ্ছে না। বাইরে যে সমস্ত ছেলেরা পড়াশুনো করছে এবং
যাদের বাড়িতে অভিভাবকগণ শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে
উদ্বুদ্ধ সেই সব ছেলেরা কিন্তু দুই দিক থেকে একটা support
পায়। মিশনে এসেও তারা এই আদর্শের কথা শুনে, বাড়িতে
গিয়েও বাবা-মার জীবনধারার মধ্যে সেইটি কিছুটা দেখতে
পায়। সেই সব ছেলেদের জীবনটা কিন্তু খুব সুন্দর হয়। এ

বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যারা এখান থেকে শিখে গিয়ে বাইরে কোন support পেলোনা বরং পরবর্তী কালে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে একটা সংঘাতের সম্মুখীন হলো তাদের জীবনে কিন্তু বিপর্যয় ঘটে গেছে এ দৃষ্টান্ত বেধেছি। অন্ততঃ ঠিক দাঁড়তে পারেনি সেই রাজনৈতিক চিন্তাধারার তোড়ের সামনে। বর্তমানে অমাদের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চলছে তার মধ্যে কতকগুলো দেখা যাবে যে ছেলেরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছে এবং প্রথম দশজনের মধ্যে অধিকাংশই মিশন স্কুলের ছাত্র। এটা একদিকে যেমন আনন্দের আবার আর একদিকে দেখা যাবে যখন নাকি সেই সব মিশন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তি হয় তখন এমন প্রতিযোগিতা মূলক সব পরীক্ষা হয় যাতে যারা খুবই ভাল মেধাবী সেই সব ছাত্ররা ভর্তি হতে সক্ষম হয়। মেধাবী ছাত্ররা একত্র হলে পরস্পরের ভেতরেও একটা প্রতিযোগিতা চলে সুতরাং সেই সংঘর্ষে আরও বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে যায় এবং ভাল রেজাল্ট করে। কিন্তু শুধু ভাল রেজাল্ট করলেই যে স্বামীজির শিক্ষা চিন্তাটা তাদের জীবনে বড় করে পড়ল এই কথাটা মনে নেওয়ার কোন কারণ নেই। পড়ল না তা বলাও ঠিক হবে না কিন্তু শুধু বুদ্ধি বৃদ্ধি, উৎকর্ষের দ্বারাই স্বামীজির আদর্শের প্রতিফলন ঘটেনা। দেখা যায় পরবর্তী জীবনে তারা তাদের জীবনকে আরও কি করে উন্নত থেকে উন্নত করে তুলবে সেই চেষ্টায়ই মগ্ন হয়ে থাকে। যারা নাকি নিম্ন মেধার ছেলে অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, স্বামীজির আদর্শ কিন্তু গভীর ভাবে তাদের জীবনকে প্রভাবিত করেছে এবং পরবর্তীকালে তারা সম্যাসই গ্রহণ করুক আর সংসারেই থাকুক স্বামীজির কথা, নেতাজির কথা, গান্ধীজির কথা, রবীন্দ্রনাথের কথা-সেই আদর্শগুলোকে জীবনে কিভাবে রূপ দেওয়া যায় চেষ্টা করছে।

আমি সম্প্রতি ইংলণ্ডের কয়েকটি জায়গায় আয়ারল্যান্ড, ওয়েস্টজার্মান ও সুইজারল্যান্ডে গিয়েছিলাম। ওখানে

মানচেষ্টারে আমাদের একটি সেন্টার কিছুদিন আগে থেকেই শুরু হয়েছিল ওটার স্থায়ী রূপ দিতেই মূলত আমার যাওয়া। যেহেতু বিদেশে এই প্রথম যাচ্ছি, সেই জন্তু আমি আগে থেকেই চিঠি লিখেছিলাম ওখানে কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে Social welfare এর যে সমস্ত কাজকর্ম, এ সব কিছু দেখে আসা এবং শিখে আসা যায় কিনা। সেই প্রশ্নে ওখানে বহু জাবগাংই আমাকে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। সেখানে যাদের দেখেছি এবং যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান দেখে এসেছি তার সঙ্গে আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার তুলনা করা যাবেনা। যাবেনা এই জন্তু যে সেখানে একটা প্রাইমারী স্কুলের বিরাট কম্পাস, স্কুলের যে ষ্টাফ, স্কুলেব ছেলেদেব শৈশব থেকে, তাদের ভেতরেব যে মূল্য প্রতিভা তাকে বিকাশের জন্তু যে চেষ্টা যে সবজাম তা ভারতবর্ষেব মত দরিদ্র দেশে সম্ভব নয়। সেখানে ছাত্র শিক্ষকেব যে সম্পর্ক বা পিতা পুত্রের যে সম্পর্ক তা আবার আমাদের কাছে খুব ভাল লাগবেন। সেখানে যেন মাগুটি একক। Social illusions টা আমার দিক থেকে যা দেখেছি খুবই কম। আমাদের ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে যে ‘পিতৃদেব ভব’ ‘মাতৃদেব ভব’ ‘আচার্য দেব ভব’ বলে বলা হয়েছে এই ভাবধারা ত কোন কিছুই নেই এমন কি বাবা-মা-দাদা দিদি বলতে কোন ইমেজই দেখতে পাওয়া যায় না।

আমরা বলি জীবনকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়। একটি ব্রহ্মচর্য, একটি গার্হস্থ্য, একটি বাণপ্রস্থ আর একটি সন্ন্যাস। তুমি ব্রহ্মচারী বালক হিসাবে লেখাপড়া শেখ তারপর গার্হস্থ্য জীবনে প্রবেশ কর, ৫০ বছর সংসার জীবন যাপন কর, তারপর পুত্র কন্যাদের হাতে সংসারের ভার দিবে ঈশ্বর চিন্তায় তুমি বাণপ্রস্থি হও তারপর সন্ন্যাস নিয়ে মুক্তি লাভ কর। এইভাবে একটি ধাপ করা আছে। এর মধ্যে অন্য তিনটি অবস্থা যাই থাক ব্রহ্মচর্য অবস্থাটা কিন্তু যে কোন বিদ্যালয়ের

পক্ষে, জীবন গঠনের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয়। এই দিকে আমাদের দেশে যতটা যত্ন নেওয়া হয়, পিতা-মাতা শিক্ষকদের যতটা দৃষ্টি ওখানে তার বিন্দুমাত্রও নেই। এটা আমার ভাল লাগেনি। ওরা ভোগের পেফালা আকণ্ঠ পান করেছেন এখন ভ্যাগের কথা শুনতে চান, মুক্তির কথা শুনতে চান।

মানব জীবনে এই mind and body বাদে আর একটা 3rd dimensions আছে তা হল soul. Even there is a 4th dimensions. রামকৃষ্ণের ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের পারে সেটা ত অনেক দূরের কথা, আমরা অনেকেই জানিনা কিন্তু এই যে mind and body র উপরে Soul বলেও একটা জিনিস আছে যা থাকতে mind and body আছে বা চলে—সেই বিষয়ে ওরা একেবারেই অজ্ঞ ছিল। এখন সেই সব কথা শুনতে আগ্রহী। ম্যানচেষ্টারে আমার বক্তৃতার বিষয়ই ছিল এই—third dimensions of human soul. আমি লক্ষ্য করেছি তন্ময় হয়ে শুনেছে ওরা আমার বক্তৃতা। সময় কখন পেরিয়ে গেছে তখন নেই। ওরা এখন exhausted হয়ে পড়েছে। কিছুটা what next what next এই জ্ঞানার আগ্রহ। আমরা কিন্তু বলতে পারি তারপরে আরও আনন্দ আরও আনন্দ আরও আনন্দ। ওরা সেই আনন্দের খবর এখনও অনেকেই পায়নি।

তবে একটা জিনিস আমার মনে হয়েছে ওখানে, ইংলণ্ডের বাবা অধিবাসী তারা তাদের পিতা-মাতাকে যতটা না ভালবাসে দেশকে ভালবাসে শতগুণ। তারা, যে কোন ছেলেমেয়ে দেশের কাছে খাও, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও বাসস্থান পাওয়ার অধিকারী। এই চারটি জিনিস একেবারে গ্যারেণ্টেড। এই গ্যারেণ্টি দিচ্ছে কে?—তার দেশ। অনেক ক্ষেত্রে মা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বাবা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বিবাহ বিচ্ছেদ ও নানা রকম সামাজিক কারণে কিন্তু এই চারটি জিনিস ওদের কাছে গ্যারেণ্টেড। ওরা-দেশকে খুব-ভালবাসে খুব পরিশ্রমীও। এরই

মধ্যেও যখন হতাশ হয়ে পড়ে মন, ভোগের মধ্যে ক্লান্তি নেমে আসে তখন মন কিছু জ্ঞানতে চায়, এমন কোন আনন্দ আছে কিনা যে আনন্দের পশ্চাতে কোন বিষাদ নেই, কোন ক্লান্তি নেই, যেখানে শুধুই আনন্দ। সেখানেমই আমাদের ভারতীয় দর্শন আসছে, ভারতীয় ধর্ম আসে। উপনিষদের বাণীতে ব্যক্ত হয়েছে যখন তুমি সকলেতে তুমি তোমাতে সকল এরকম দেখবে তখনই আনন্দ আনন্দ আনন্দ কেবল। এই যে তবুটা এটা শোনবার জন্ত ওঁরা এখন ব্যাকুল।

আম্মারল্যাগে দেখলাম ওঁরা কেউ কেউ সংস্কৃত পড়ছে, আমাদের বেদান্ত পড়ছে, নিরামিষ খায়। এটা আমার খুব ভাল লেগেছে। সুইজারল্যান্ডেও খুব ভাল লেগেছে। জার্মানীতে ওঁরা খুব কর্মঠ ও বলিষ্ঠ কিন্তু কতটা ধর্ম প্রবণ তা আমি বুঝতে পারিনি, ওঁদের সঙ্গে মিশবার সুযোগ তেমন হয়নি। ঠাকুর রামকৃষ্ণের থেকে স্বামীজির নামটা ওখানে বেশি প্রচারিত এবং স্বামীজির আদর্শের কথা ওঁরা অনেকেই জানে এবং খুব প্রশংসা করে।

আমাদের বা ওঁদের কাছ থেকে শিখবার আছে তা হল দেশের প্রতি একটা সমস্ত বোধ, আমাদের দেশে তা নেই এত ধর্ম থাকতেও নেই। এটা আমাদের দুঃভাগ্য। আমাকে ওখানে অনেকেই প্রশ্ন করেছে—তুমি যে এত ধর্মের কথা বলছ, আধ্যাত্মিকতার কথা বলছ তোমার দেশে তাই ভাইকে খুন করছে, নির্দোষ লোককে মেরে ফেলছে, রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী নয় এমন মানুষকে বাঁচতে দিচ্ছেনা—কেন এ সব হচ্ছে? আমাকে এ সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। এটা আমাদের দুর্বলতা। ধর্ম বলতে কি বোঝায় তা আমরা জানিনা—অন্যকে জানানাবো কি করে! এই সব দেখে এসে মনে দুঃখ হয়েছে এই ভেবে যে আমরা আমাদের দেশকে সকলে মিলে সেই ভাবে গড়ে তুলতে পারিনি। দেশের প্রতি আমাদের সেই অনুভব নেই।

আবার যে জিনিসটা ওঁদের দেশে নেই তা কিন্তু আমাদের আছে। আমরা যদি একটু সজাগ হই তো দেখতে পাবো আধ্যাত্মিক শক্তিতে মানব কল্যাণ চিন্তায় আমরা কিন্তু অনেক বেশি এগিয়ে আছি। যদিও কোন কোন জায়গায় রাজনৈতিক মতানৈক্য ধর্মের মতভেদের ফলে কিছু কিছু হিংসাত্মক কার্যকলাপ ঘটছে তথাপি সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষ কিন্তু আত্মও শান্তি মৈত্রী ও প্রেমের বাণী বিশ্ববাসীকে শোনাতে সক্ষম। একমাত্র ভারতবর্ষই একথা বলতে পারে—‘সর্বো মুখেন ভবন্তু।’

ঋষি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা করে প্রথম যে প্রার্থনা করেছে সেই প্রার্থনা হল—সবাই ভাল থাকুক। সকলে নিরোগ থাকুক সকলেই ভাল দেখুক—শুধু ভারতবর্ষের নয় শুধু ইংল্যান্ড আয়রল্যান্ডের নয় পৃথিবীর সব জায়গায় সব প্রাণী সব জীব সব মানুষকেই ‘যেন কখনও দুঃখ না পায় এই যে উচ্চ চিন্তা, বিশ্বমানুষকে যে এক করে নেওয়া তা দেশের মানুষেরই চিন্তা।

ওঁদের থেকেও আমাদের নিতে হবে আমাদের থেকেও ওঁদের নিতে হবে। এ দু’ঘের মিলন যে হবে,—স্বামীজির যে কথা ছিল **western contents and eastern methods** আমরা ওঁদের কাছ থেকে **science** এবং **technology** নেব কিন্তু আমাদের **method** এ এগোব। সেই গুরুমুখী শিক্ষায় যেতে হবে সেই শ্রদ্ধা চাই সেই পরিশ্রম চাই সেই বীর্য চাই তা হলেই শিক্ষা এবং জীবন সার্থক হবে। বাইরে গিয়ে অনুভব হল এখন দেশে এসে চেষ্টা করছি সেগুলো কিছু কিছু কার্যকরী করে তোলার।

পৃথিবীর বুকে আঁকা উনিশশো অষ্টআশির ছবি

মাধব ভট্টাচার্য

পৃথিবীর মানুষকে হুম পাড়িয়ে রেখে ধীর পা ফেলে ফেলে ক’দিন আগে সে চলে গেল। সময়ের পথ ধরে যে এসেছিল সময়ের পথ ধবেই সে নির্লিপ্ত ভাবে ফিরে গেল। পৃথিবীতে আমরা তার নাম রেখেছিলাম উনিশশো অষ্টআশি। —উনিশশো অষ্টআশি এই মাটির পথ হেঁটে চলে গেল। সে আর ফিরে আসবে না। শীতের ভারী বাতাস মুড়ি দিয়ে গভীর রাতে যারা জেগেছিল তারা তার চলে যাওয়াকে দেখেছে। মাঝ রাতে দূরের ঘন অন্ধকারে অষ্ট-আশি মিলিয়ে গেল ধীরে ধীরে। একবারও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখেনি তার ফেলে যাওয়া পৃথিবীকে। পৃথিবীর বুকে তার আঁকা ছবির এ্যালবাম পড়ে রইলো। পড়ে রইলো তার সুখ দুঃখের স্মৃতি! তাকে নিয়ে আর কেউ দিন গুনবেনা। ইতিহাস হয়ে সে শুধু বেঁচে থাকবে মানুষের মনে এখন থেকে।

একটু পেছন ফিরে তাকাই। অষ্টআশির সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয়ের দিনটি ছিল মধুর। ভোরের আকাশ আবিরে রাঙিয়ে অষ্টআশির সূর্য ওঠেছিল আকাশে। আবার সন্ধ্যায় কেন কি জানি অভিমানে জল বয়েছে। সল্টলেক স্টেডিয়ামে রুশ মহোৎসবের সূচনা করেই কলকাতায় অষ্টআশির যাত্রা শুরু হয়েছিল এর পরেও রুষ্টিতে ভিজে ভিজে সংহতির গান শুনেছে এখানে বসে কলকাতার মানুষ। “নব আনন্দে জাগো” গানের সুর দিয়ে বাঁধা হয়েছিল সংহতির বন্ধন।

অষ্টআশির আবির্ভাব এভাবে হলেও তার প্রথম দিনটি বোধ করি আরও একটি কারণে স্মরণীয় করে তুলেছিল বিশ্বের দুই শক্তিশালী বাচ্চের কর্ণধার মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রেগন ও রুশ

নেতা মিখাইল গর্বাচভ তাঁদের আন্তর্মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্রম দ্বারা বিষয়ক চুক্তির প্রতিশ্রুতি দিয়ে। পৃথিবীর মানুষের কাছে এই প্রতিশ্রুতি একটা বড় সোয়াস্তি ছিল সন্দেহ নেই। তাই বলে রাজনীতি কি মানুষকে চিন্তাহীন জীবন যাপনের পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পেরেছে? — পারেনি। রাজনীতির ধর্মই অস্থিরতা। মানুষের অস্থির চিন্তাই তার হাল। তা দিয়েই তার মাটি কর্ষণ।

দূরের আকাশে না হয় নাই বা তাকালাম। স্বদেশের মাটিতেই তো কত কি ঘটে গেল! বরাক উপত্যকায় অসম গণ পরিষদ সরকারের পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারে জন জীবন বিপন্ন হলো, ত্রিপুরা উপদ্রুত বলে ঘোষিত হল। -পরে অবশিষ্ট গেরিলারা অস্ত্র সমর্পন করে, টি, এন, ভি নেতা চুক্তিতে সইও করেন। তামিলনাড়ুর মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে রাষ্ট্রপতির শাসন জারী হল। নাগাল্যান্ডও হল তাই। মধ্যপ্রদেশ আর বিহারে মুখ্যমন্ত্রী পাণ্টালো, পাণ্টালো উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রেও।

কংগ্রেসের একনিষ্ট প্রেমিক অশোক সেন পাণ্টি খেয়ে জন-মোচায় এলেন। জ্যোতি বসু খুশি হয়ে একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়েই সৌজন্য সাক্ষাৎ করে এলেন।

পাঞ্জাব তো বছর ভর উত্তপ্ত হয়েই রইলো। ধর্মস্থানে অস্ত্রবহন নিষিদ্ধ আর্ডিনাল হলেই বা কি যে হাত একবার অস্ত্র তুলে নিয়েছে, যে হাত একবার খুনের স্বাদ পেয়েছে সে কি পারে রাতারাতি অস্ত্র ফেলে দিয়ে সাধু বনে যেতে।

পাঞ্জাব আছে, আছে খালিস্তানী জিগিরও। রাজীবের এক নম্বর বিরোধী ভি. পি. সিং যিনি '৮৭র সেরা মানুষের খেতাব পেয়েছিলেন '৮৮র মাঝামাঝি এসে জনগণের বিপুল সমর্থন পেয়ে এলাহাবাদের মাটি কামড়ে ধরলেন। এ কামড় কতটা শক্ত বুঝা যাবে আর কিছুদিন গেলে। কংগ্রেসের বিকল্প গড়তে দেবীলাল ও রামরাও ওঠে পড়ে লেগেছেন। বিরোধীরা মিলে রাজীবের বিরুদ্ধে মামলা করারও ছক কেটেছিলেন।

মন্ত্রীসভায় রাজীব গান্ধীর বদল বোধকরি বিশ্ব রেকর্ড করেছে। মসনদে বসে এ যাবৎ তিনি কুড়িবার মন্ত্রীসভা ভাঙা-গড়া করেছেন। দল থেকে বহিষ্কৃত প্রমথ মুখার্জী সহ আরও অনেককেই ক'দিন আগে কাছে টেনে নিয়েছেন রাজীবজী। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির পদ থেকে চলে যেতে হল প্রিয় দাশমূলীকে। তাঁর জায়গায় এসে বসেছেন গণিখান চৌধুরী। রাজ্য কংগ্রেসের অনেকেই এই দুই নেতার আগমনে উল্লাস করেছেন, গলায় শুধু মালা পরিয়েই কাস্তি থাকেননি তরুণী দুধ ঢেলে পা খুইয়ে দিয়েছেন তাঁদের প্রিয় নেতাদের।

পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতিবসু সরকারকে বঙ্গোপসাগরে ফেলে দেওয়ার কথা এর আগেও অনেক বারই বলেছেন গণিখান এবার প্রদেশ সভাপতির পদে বসেই আর একবার এই হুঁকার ছেড়েছেন। জ্যোতি বসুকে উৎখাত করার জন্তে জনগণকে স্টেনগান আর লাঠি কিনে রাখার কথা আগে থেকেই বলে রেখেছিলেন।

গণিখানের কথায় জ্যোতিবাবুর অবশ্য কোন ভাবান্তরই কখনও লক্ষ্য করা যায়নি। তবে এ সব বলে গণিখানের একটা লাভ হয়েছে। তা হল কাগজের লোকেরা তাঁর পদবী বাড়িয়ে দিয়েছেন অনেক! কেউ বলেছেন স্টেনখান, কেউবা ছড়াখান, হানিখান, চাবুক চৌধুরী এইসব।

দার্জিলিং তো বছর জুড়েই উদ্ভাল হয়েছিল। কত মানুষ ঘর ছাড়া হয়েছে, কত মানুষের প্রাণ গেছে। এমন অবস্থা একসময় দাঁড়িয়ে গেল যে জি, এন, এল, এফ নেতা ঘিসিংই চুকতে পারছিলেন না দার্জিলিঙে! গোখালগাওঁর দাবী গেল, চুক্তির জন্তে বারবার দিল্লী ছুটে ছুটে হুয়ারাণ হয়ে পড়লেন ঘিসিং। জয় অবশ্য ঘিসিংয়েরই হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক পার্বত্য পরিষদ চুক্তি হল কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে। নির্বাচনও হয়ে গেল ডিসেম্বরের ১৬ তারিখে। পাহাড়ের মানুষ পাহাড়ের মানুষকেই ভাগবাসার প্রমাণ দিল নির্বাচনে।

অস্থিরতা প্রকাশ করেছে বাড়িখুঁজিরাও। মাঝরাতে সশস্ত্র জনতার “জয় বাড়িখুঁজি” ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে সাঁওতালীরা নাচ করেছে মাদল আর ধামসা বাজিয়ে।

প্রতি বছরের মত এবারও ভারত বনধু আর বাংলা বনধু বাদ যায়নি। ১৫ মার্চ ভারত বনধুর ডাক দিয়ে রাজীব বিরোধীরা সোচ্চার হয়ে উঠেন। ১০ জানুয়ারী বাঙ্গালোরের ‘জ্যোৎসবে’ জ্যোতি বসু তো বলেই উঠলেন—ভারত বনধুই হোক রাজীব উৎখাতের প্রথম ধাপ। জ্যোতিবাবু একবার রাজীবের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কথা তুলনা করেছিলেন সাধারণ বাড়ির গৃহস্থের সঙ্গে। রাজীবকে অবশ্য এসব স্থূল কথার কোন আমল দিতে দেখা যায়নি কখনও।

অদূর ভবিষ্যতে এদেশে বিপ্লব হবার সম্ভাবনা নেই তা বুঝে গেছেন মন্ত্রী ভক্তিব্রত মণ্ডল। তিনি উপসন্ধি করেছেন শুধু কথার রাজনীতিতে বিপ্লব হয় না।

অদেশের মানুষের সমালোচনার মুকুট মাথায় পরেই দেশ চালাচ্ছেন ভারতের প্রধান মন্ত্রী রাজীব গান্ধী। বোফর্স, ফেমার ফেল্ড এর মত কলেঙ্কারীর সাথে-পাঁচে না থাকতে চাইলেও নিন্দুকরা সিঁদু খুঁড়তে চাইছে সেখানেই। দেশের জন্তে রাজীবের শুভ ইচ্ছা রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কটরমনের কথার সঙ্গে শুর মিলিয়েছে—বিবাদ বিভেদহীন একটা সমাজ, ভারত চায় বিবাদমুক্ত একটা পৃথিবী গড়ে তুলতে। —এই শুভ ইচ্ছা কবে যে ফলপ্রসূ হবে নেটাই কথা।

ইতালীর প্রধান মন্ত্রী অবশ্য ভারতের প্রশংসাই কবেছেন। তিনি বলেছেন—ভারতের কাছে শেখার আছে অনেক।

বেকারদের জন্তে একটা শুভ সংবাদ দিয়েছেন প্রধান মন্ত্রী রাজীব। সংবাদটি হল—সাত বছর পর দেশে আব বেকার বলে কেউ থাকবে না। গরীব হটাঁবার প্রোগ্রামও দিয়েছে কংগ্রেস দল। আর একটা শুভ সংবাদ হল এদেশের অষ্টদশ-ঊন্বদশশতাব্দীর

ভোটাধিকারের পাসপোর্ট পেয়ে গেলেন এখন থেকে সমালোচনার ঝাপটা থেকে রেহাই পাননি জ্যোতি বসু সরকারও। বোফোর্সের মত এতবড় কেলেকারী মা হলেও বসু জড়ালেন বেঙ্গল ল্যাম্প আর ট্রাম কেলেকারীর জালে কথা উঠেছে মহাকরণে জ্যোতি বসুর চেম্বার সাজানোর ১২ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা নিয়ে। আর. এস. পি. আর ফরওয়ার্ড ব্রকের সঙ্গে ঝগড়াটাও প্রকৃষ্ট হয়ে উঠলো। যতীন চক্রবর্তী নাটক জমিয়ে মন্ত্রীও থেকে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন। জ্যোতি বসু এক সময় বলেছিলেন আমাদের ওশাসন সম্পূর্ণ ছনীতি মুক্ত বলা যায় না, এই কাঠামোয় ছনীতি দূর করা সম্ভব নয়।

সরকারের প্রতি ক্ষেপে উঠেছিলেন সম্মান দগের প্রবক্তা সম্মানী বালক ব্রহ্মচারীও রেগে গিয়ে তিনি বলে ফেললেন তিন দিনের মধ্যে সমাজের সব আগাছা উপড়ে ফেলে দেবেন।

কেম্দের টালবাহানার তোয়াক্কা না করে রাজ্য সরকার বক্রেশ্বর তাপ বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে তোলার কাজ তুলে নিয়েছেন নিজেদের হাতে। তবে হলদিয়ায় পেট্রোকেম রাজ্যের একার পক্ষে সম্ভব নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী এই সেদিন বলে দিয়েছেন।

সুপরিচিত বিধায়ক সুব্রত মুখার্জী রাজনীতির ফাঁকে ফাঁকে টি. ভি. সিরিয়ালেও নামছেন এখন মুনমুনের সঙ্গে। অশ্রু দেওখালে রাজনীতির পোষ্টারও পাঠিয়েছেন সেদিন। শীগগিরই দিল্লীতে গিয়ে আমরণ অনশনে শুয়ে পড়বেন বলে ঘোষণা করেছেন।

কেলেঙ্কারীর খবর বেরিয়েছে প্রাক্তন সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের জামাই চুরবানভকে নিয়েও। খুব নেওয়ার অপরাধে। বেচারীর জেল হয়ে গেল ১৫ বছর।

৮৮'র বিশ্ব রাজনীতির একটা বড় খবর বেনজীর ভূট্টো। বছরের শুরুতেই তিনি আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন পার্কহানে জিয়া সরকারের বিরুদ্ধে। মে মাসের শেষাংশে সংসদ ভেঙ্গে দিয়ে

জিয়া সরকার নির্বাচনের ডাক দিলেন নভেম্বরের ১৬। নির্বাচনে লড়াই করার সুযোগ হল না জিয়াউল হকের। তার আগেই বিমান দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন তিনি। নির্বাচন হবে কি হবে না পাকিস্তানের রাজনৈতিক মহলে এই নিয়ে টানা-পোড়েন চললেও নির্বাচন হল নির্দিষ্ট দিনেই। জয় হল পাকিস্তান পিপলস্ পাটি'র। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন বেনজীর ভুট্টো। সার্কেবও চেয়ারম্যান পদটি এবার তাঁরই। ভিয়েনার ক্রিস্টি ফাউন্ডেশন গত জুলাই মাসে বেনজীরকে ১৯৮৮-র মানবাধিকার রক্ষা পুরস্কার দিয়ে সম্মান জানিয়েছে। ইসলামাবাদে এবারের সার্ক সম্মেলনে বেনজীর-রাজীব বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। তাৎপর্যপূর্ণ রাজীভের চীন সফর ও নিকাবাগুয়াভাইশ প্রেসিডেন্ট সার্গিও রামিরেজ মার্কডোও পেয়েছেন এই পুরস্কার। পশ্চিম জার্মানীর একটি কাগজ মিখাইল গবর্চভকে অষ্ট্রাশির সেরা মানুষ বলে ঘোষণা করেছে। গবর্চভের পেরেত্রেকাগ্রাসনস্ত নীতি আলোড়ন সৃষ্টি করেছে রাশিয়ায়। সুপ্রিম কোর্টের রায় পেয়ে সোভিয়েতে এখন নগ্নতাও ছাড়পত্র পেয়ে গেল। তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকাদের কাছে এক মস্ত খবর।

বাংলাদেশে এরশাদ সরকার ত নিজের দেশটাকে ইসলামী রাষ্ট্র বলেই ঘোষণা করে দিলেন। এই নিয়ে বাংলাদেশে বিরোধী দল আর বুদ্ধিজীবীরা মিলে ও তিবাদে মোচ্চার হলেন। ৫০০ মহিলার এক প্রতিবাদ মিছিল ষেরুল ঢাকায় গত ১৩ মার্চ। বনধও পালিত হল দেশে।

বর্মান্ব ফৌজি শাসন হল। হাইতির প্রেসিডেন্ট খুন হল। মালদ্বীপে অভ্যুত্থান হল। নতুন এক রাষ্ট্র প্যালেষ্টাইনের জন্ম হল এই অষ্ট্রাশিতেই।

নির্বাচন হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। হোয়াইট হাউস জিতে নিলেন জর্জ বুশ। নতুন বছরে রোনাল্ড রেগনের স্থলাভিষিক্ত হতে যাচ্ছেন বুশ।

বিতর্ক উঠেছে 'লা মুই বেঙ্গলী নিয়ে। ইলরাইলের হয়ে

ওগুচর বৃত্তির লগ্নে গভ জাহুয়াবীতে তিনজন সিরীসর ফাঁসি হয়ে গেল দামাস্কাসে। ইন্দিরা হত্যায় অভিযুক্ত সতবন্ত আর কেহরের ফাঁসির লুকুম হয়েও থেমে গেছে অপাত্তত। সতবন্ত তার জীকে চিঠি লিখে জানিয়েছে কটা দিন অপেক্ষা করার জগ্নে। অল্প দিনের মধ্যেই তাদের দু'জনার মিলন হবে। আর যাই হোক সতবন্ত যে খুব আশাবাদী সন্দেহ নেই।

শিক্ষার কিছু হোক বা না হোক ভাবনা চিন্তায় বিরাম নেই। স্কুলের ছোলমেয়েদের শিক্ষাবর্ষে সময় পাণ্টে গেল এ বছর থেকে। মেকলের শিক্ষা পদ্ধতিতেও আর চলছে না, তা বদল করে দেশে জাতীয় শিক্ষানীতিব ভিত্তি দৈবী করতে হবে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আদর্শে-এরকমই ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী কৃষ্ণ শাহী। স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করার কথা বলেছেন। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডঃ ফুফল হাসান। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতে বছরের শুরুতেই এলেন ভাস্কর রায়চৌধুরী। তাঁর প্রথম কথাই হল ভূমিকম্প না হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পেছবেনা।

খবরের কি শেষ আছে? আরো কত বিচিত্র খবর ছড়িয়ে রয়েছে কত দিকে। মহাক শে থেকে উচ্চতা বেড়ে গেছে মহাকাশ-চারীর। সোভিয়েত মহাকাশচারী ইউরি রোমানেনকো সাড়ে দশ মাস মহাকাশে থাকায় তিনি এক সেন্টিমিটার লম্বা হয়ে গেছেন। রাজস্থান থেকে বেঙ্গুন 'ইন্দ্রধনুক' উড়ে এল কলকাতায়। মানুষ নিয়ে এই প্রথম একটি বেঙ্গুন কলকাতার আকাশে উড়লো। আটকোটি বছর আগেকার মোমাছির জীবন্য পাওয়া গেছে নিউ জর্সিতে। হাসপাতাল চত্বরে ধূমপান নিষিদ্ধ হয়েছে তবে কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকেই পাঁচশো টাকায় শিশু বিক্রি হল, শিলিগুড়ির হাসপাতালে সদ্যজাত শিশু পাণ্টাপাণ্ট হয়ে গেল। নবজাত শিশুক হাসপাতাল থেকে কুকুর টেনে নিয়ে গিয়ে খেয়ে ফেললো। ছুধের শিশুক ইঁদুরে খেয়ে নেবারও খবর আছে।

আবার, কুকুরর হুঁধ খেয়ে বড় হয়েছে মোহনকে তো কলকাতার অনেকেই এখন চেনেন।

ফুচকা অভিযানে মন্ত্রী প্রশান্ত শুর কলকাতার রাস্তার নেমেছেন। অশীম দাশগুপ্তও নেমেছিলেন ট্রাফিক কন্ট্রোলে। পেট্রোলের দাম বাড়ল, তাই নিয়ে অভিনব মিছিল বেরুল রাজপথে। সি, পি, এম এর রাজ্য সম্মেলনে ঐতিহাসিক মিছিল বেরুল সন্টলেকে। ত্রিপুরায় ২৫ শ্ববতীকে পুলিশের গণধর্ষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল হল রাজধানী দিল্লীতে।

রেপসিড খেয়ে মরল বেহালায়। পঙ্গু হল কতজন! এখন চলছে মাছ। তবে যাদবপুর অঞ্চলের পুকুরে জাল ফেললে মাছের বদলে উঠে আসছে মুক্কা।

বধু হত্যার কথা ছেড়েই দিলাম, কানপুরের কুলিবাজারের তিন বোন একসাথে ফাঁসিতে ঝুললো। হাওড়ার চাঁদপিড়ি-তলাতেও তিন ভাই বোন বেকার বাবাকে দুঃসহ ক্ষুধার জ্বালা থেকে মুক্ত করতে নিজেরাই ফাঁসিতে ঝুলে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেল। অনাথ আশ্রমের শিশুরাও কোথাও কোথাও মারমুখী হয়ে উঠলো।

পুকুলিয়ার সেই নয় বছর বয়েসের মেয়ে মোমুসমী বেন এনসাইক্লোপেডিয়া। যার বা কিছু জানার জিজ্ঞেস করলেই সে বলে দিচ্ছে। পুরীর কাছে আর একটি অবাক ছেলের সন্ধান মিলেছে। তিন বছর তার বয়েস। তিনটি ভাষায় সে কথা বলতে পারে অনর্গল। মাতৃভাষা ওড়িয়া, হিন্দি আর ইংরেজী। সম্রাটও কম যায় কিসে! ছ'মাসের সম্রাট ত শূভাষ সরোবরে এসে সাঁতার ফেটে গেল।

মাগেলার মুক্তির দাবী করলে কি হবে শ্রিটোরিয়া সরকার তার মুক্তি দেয়নি এখনও। দিল্লীতে তার নামে একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে।

প্রকৃতির রোষ নেমে এসেছে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে অষ্টাশিতে। ভূমিকম্পের শিকার হল বিহার, নেপাল, আসাম। কলকা-

তার মানুষও ভূমিকম্পের ধাক্কা খেয়ে ঘুম থেকে উঠেছেন ১১ ফেব্রুয়ারীর সকালে। ভূমিকম্প ৬.০ লোক মরল দক্ষিণ চীনে। মাটি কাঁপার শেষ ধাক্কা এসে লাগলো রাশিয়াব আর্মেনিয়ায়। গোটা শহর মাটির তলায় চাপা পড়ে গেল। মানুষ মরল এক লক্ষ।

শুধু কি ভূমিকম্প! কুইনলের কাছে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রেল হ্রবটনা ঘটলো গত জুলাই মাসে। আর এইট সেদিন লগুনে ধাক্কা খেল তিন তিনটি ট্রেন। রাশিয়ায়ত গাড়ীতে ধরল আগুন।

নিয়ন্ত্রণের ধাক্কা কলকাতাত এইদম সহিতে পারে না। আর এবারে তার বুকের উপর দিয়েই নেচে গেল সেই ঝড়, যা কিনা বিগত আড়াইশ বছরেও কেউ দেখেনি-শুনেনি। ঝড়ের ধাক্কা খেয়ে মরল বাংলাদেশের কয়েক হাজার মানুষ।

রামায়ণ মণ্ডারত ত আছেই, টিভির পর্দায় তমস জনপ্রিয়তা কেড়েছে। এবারে অমিতাভ বচ্চনের শাহেনশা প্রথম প্রথম সিনেমার পর্দায় ভিড় বাড়ালেও খুব একটা এগোয়নি। সত্যজিৎ রায় আবার নতুন ধরনের এক ছবি তৈরীর কাজে হাত দিয়েছেন “গণশত্রু”।

খেলা ত মানুষকে ঘর থেকে টেনে টেনে মাঠে আমায়। গাভাসকার গত তিরিশ বছরের হিসাবে শ্রেষ্ঠ ব্যাটসম্যানের পুরস্কার পেলেন। ক্রিকেট থেকে হিঁদায় নিল বিশ্বনাথ। উইম্বলডন টেনিসে ন’বারের বিজয়িনী মাটি নাকে হারিয়ে দিয়েছেন এবারে জার্মান ডকগী স্টেফিগ্রাক।

নাইজেরিয়ার ফুটবলার এমকো কঁসকাতায় খেলাতে এসে ফটোগ্রাফারকে মেরে গ্রেপ্তার হল। পুলিশ ঘরে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরে দিল ডাকে। সিওলের অলিম্পিকে এবার ভাবড়ের পরাজয় বেন জনসনকে দেওয়া পক্ষ কড়ে নিল ডোপ করার অপরাধে।

চুক্তি ভঙ্গ করে খবরের কাগজে লেখার অপরাধে ক্রিকেট অধিনায়ক দিলীপ বেঙসবকার আস্ত জাতিক ক্রিকেট ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়লেন সাময়িকভাবে। আলসপর্বতের মাথায় মাথায় তিন হাতি সজ্জী করে ঘুরে ঘুরে ক্রিকেটের নক্ষত্র ইরাম বণ্ডা

লিউকোমিয়া গবেষণার ক্ষেত্রে সস্তর লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করে দিলেন তাঁর দেশকে। বিখ্যাত ফুটবলার পেরে জানিয়েছেন, যদি দেশ-বাসী জান তাহলে তিনি ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট হতে রাজী আছেন।

অষ্টাশী যাওয়ার আগে পৃথিবী থেকে অনেককেই নিয়ে গেল। সকলের পরিচয় ত আর জানা নেই। চলে গেলেন সীমান্ত গান্ধী বাদশা খান, কাঁচের মানুষ সমরেশ বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সন্তোষ দত্ত, রাজকাপুর, জঙ্গল সাঁওতাল, সম্রাসী মহারাজ গঙ্গী-রানন্দ ও আরও অনেকেই। উনিশশো অষ্টাশী এদের লাক্ষী হয়ে রইলো। পড়ে রইলো অষ্টাশীর এ্যালবাম জুড়ে পৃথিবীর সুখ-দুঃখ।

কুন্তিবাস/সুজিৎ কুমার রায়

জন্মতিথি, সে ত বছরে বছরে ফিরে আসে,
ফুলের মালা, সেও গাঁথা হয় প্রতিবারে।
সেই মামুলি আমলের বক্তৃতা,
সেই রামনাথ কথা, সীতা লক্ষণের বীরত্ব কাহিনী,
নানা চরিত্রের একই কথা
শুধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা।
বক্তা পালটায় বছরে বছরে,
স্মৃতি সভায় শ্রোতা বাড়ে, কটম,
মেলা বসে,
দেখা হয় আত্মীয়বার্গের সাথে
দূর কিংবা নিকটের,
শুধু তোমারই জন্মে
কষি কুন্তিবাস।

পত্র-পত্রিকা আলোচনা.

প্রতিবাদী চেতনা—(বিশেষ সংখ্যা) সম্পাদকমণ্ডলী—

বিপ্লব দাসগুপ্ত, জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, অমর কর। ১৪নং লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র রোড, শাস্তিপুর, নদীয়া। —নাটক, প্রবন্ধ সাক্ষাৎকার কবিতা ইত্যাদি বিভিন্ন স্বাদের রচনা নিয়ে এই বিশেষ সংখ্যাটির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে।

মিরান্দা—(শারদ সংখ্যা ১৩৯৫, ত্রৈমাসিক) সম্পাদক—

বিপ্লব মৈত্র। ২৩নং, মানিকতলা মেন রোড, ফ্ল্যাট—৫৪, কলকাতা—৭০০০৫৪ থেকে প্রকাশিত। নতুন মুখ নিয়ে মিরান্দা এসেছে পাঠকের দরজায়। ঝাপি ভরা তার যথাবীতি প্রবন্ধ, অনুবাদগল্প, কবিতা, ছোটগল্প-ও অম্লবাদ কবিতায়। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের একটি অপ্রকাশিত কবিতা নবজাতক মিরান্দাকে সমৃদ্ধ করেছে। এছাড়াও শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুক্লসম্বৎ বসুর কবিতা পড়তে ভালো লাগে।

পৃথিবীর পাঠশালা—সম্পাদক—অরুণাভ চক্রবর্তী।

১৪/১ টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা-২৫। জুলাই-আগষ্ট সংখ্যা পৃথিবীর পাঠশালা মূলতঃ তথ্যধর্মী। বিশেষ শ্রেণীর পাঠক এর থেকে খোরাক সংগ্রহ করতে পারেন।

কথা—শারদ সংকলন সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিবরণক ত্রৈমাসিক পত্রিকা।

সম্পাদক—গৌতম ভট্টাচার্য। মহিষবাথান, ডাকঘর—রহমতপুর জেলা নদীয়া। গল্প, প্রবন্ধ ছাড়াও স্বাভাবিক প্রবণতায় অজস্র কবিতার মধ্যে নতুন ও পুরাতনের সমাবেশ। যে কোন পত্রিকায় এত বেশি বানান ভুল থাকলে তা বড়ই দুষ্টিকটু ঠেকে। একটা পাতায় সমস্ত ভুল সংশোধন জড়ো না করে ছাপানোর সময় বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখলে পত্রিকা পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে নিঃসন্দেহে।

সাহিত্য সৈকত/জানু.-মার্চ '৮৯

টানাপোড়ন—(সমবায় সংস্থা সংখ্যা) সম্পাদক: হরিপদ বসাক। বুইচা বসাকপাড়া, নদীয়া। এই পত্রিকার বিশেষত্ব হল গল্প, কবিতা, প্রবন্ধের সমস্ত অবয়বে তাঁতীর সুখ-তথ্য ও টানা—পোড়নের স্মৃতি মিহি করে বোনা। এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে অস্ত্রাঙ্গ ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা থেকে বৈশিষ্ট্য দাবী করে। তবে লেখা পরিবেশনে নতুনত্বের প্রয়োজন আছে।

পাথর ঠিকানা—(শারদ সংখ্যা) সম্পাদক: মানব বিশ্বাস। শঙ্কনগর, বাঁশবেড়িয়া, হুগলী। গল্প, কবিতা প্রবন্ধ, চিঠি পত্রে ঠাসা এই সংখ্যাটি। সম্রাট সেনের মুদ্রারাক্ষস গল্পটি সমরোপযোগী। কিছু সুখপাঠ্য কবিতা রয়েছে এই পত্রিকায়।

অঙ্গীকার—(শারদ সংখ্যা) সম্পাদক—রামরঞ্জন রায়। কুশপাতা, ঘাটাল, মেদিনীপুর। ছ' বছরে পা দিয়ে অঙ্গীকার অনেকটা বলিষ্ঠপায়ে হাঁটিতে শিখেছে। উন্নত মানের বেশ কিছু গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এতে রয়েছে যা মনকে আপনিই টানে।

ঘোষালিসা—(শারদ সংখ্যা)—সম্পাদক: মানস কুমার চিনি। মেচেদা, মেদিনীপুর। প্রবন্ধ, গল্প ও অধিকাংশ কবিতার মোড়া ঘোষালিসার এই সংখ্যাটি। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্রের দুটি চিঠিও ছাপা হয়েছে এতে। ড: রামরঞ্জন রায়ের 'প্রেমেন্দ্র মিত্রের' শিশু সাহিত্য প্রসঙ্গ লেখাটি পত্রিকার মান বৃদ্ধি করেছে।

স্রোতধ্বনী—(পাক্ষিক সংবাদ পত্র) সম্পাদক—অশোক কুমার দত্ত। নাশরাপাড়া লেন, রাণাঘাট, নদীয়া। নাম দেখেই বোঝা যায় স্রোতধ্বনী মূল্যত সংবাদ পত্র। সংবাদের কারবারী সঙ্গে একটি কবিতাও যুক্ত হয়েছে।

প্রবাহী—(শারদ সংখ্যা) তপন কুমার ভট্টাচার্য সম্পাদিত। রায়পাড়া, রায়বাড়ী কৃষ্ণনগর নদীয়া থেকে প্রকাশিত।

অধিকাংশ লিট্‌ল ম্যাগাজিনেব মত শারদীয়া প্রবাহীও গল্প, প্রবন্ধ, কবিতায় সাজানো। দৃষ্টিকটু ঠেকে বড় বেশি বানান ভুল এবং সেগুলিকে কালি দিয়ে ঠিঠঠাক করার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে।

প্রগতিবার্তা—(শারদ সংখ্যা) জনবিজ্ঞান বিষয়ক পাক্ষিক পত্রিকা। সম্পাদক—অমূল্য মণ্ডল। কল্যাণী, নদীয়া। সংবাদ ছাড়াও এই সংখ্যাটিতে ‘রাশিয়ার ইকলজি ভাবনা সম্পর্কে প্রস্তোত্তরে’ আলোচনাটি পত্রিকাটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

মুক্তকণ্ঠ—(ক্ষুদিরাম সংকলন) সম্পাদক—ডি. কৃষ্ণ রাও ও সেখ সাইমুল আলম। মেচেদা রেল কলোনী, মেদিনীপুর। এই সংখ্যাটিতে কবিতা ও প্রবন্ধের মূল সুর শহীদ ক্ষুদিরামকে নিষেই। ছাপা সুন্দর। এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়ে ক্ষুদিরাম সম্পর্কে অনুসন্ধানী পাঠক মাত্রই উপকৃত হবেন।

আনন্দ—(শারদ সংখ্যা) সম্পাদক মণ্ডলী। কলিকাতা। ইলেকট্রিক সাপ্লাই কর্পোরেশন, ভিক্টোরিয়া হাউস, কলিকাতা থেকে প্রকাশিত। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র: আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে কমলেশ সেনের প্রবন্ধ, ধারাবাহিক রচনা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও সাধনা—লেখক সুরেশ দেব, মূর্ত্ত্ত দাশগুপ্তের গল্প ‘মতিদা’ এবং রাজ সুশান্ত মিত্রের কবিতা—মনিহার উন্নত মানের লেখা। এছাড়াও অন্যান্য প্রায় অধিকাংশ লেখার মধ্যে ভাবনার খোরাক ছাড়িয়ে আছে। ছাপাও ভাল।

১

‘সাহিত্য সৈকত’ এর পরবর্তী সংখ্যা আগামী ১মে নতুন সংযোজন সহ প্রকাশিত হবে।

টুকরো খবর

বগুলা উচ্চ বিদ্যালয় হীরক জয়ন্তী উৎসব

নদীয়া জেলার অন্যতম প্রাচীন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ৬০ বছর পূর্তিতে গত ৯ থেকে ১৫ জানুয়ারী হীরক জয়ন্তী উৎসব পালন করে।

বিভিন্ন বিভাগীয় ও সংস্থাব্যবস্থাপিত এক বর্ণাঢ্য পদযাত্রা বগুলা পরিভ্রমণ করে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করে। ৬০টি বৃক্ষ রোপনের মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে উৎসবের উদ্বোধন করেন সাংসদ বিভা ঘোষগোস্বামী। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন পঃ ব. উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি অধ্যাপক অনিল কুমার বসাক পৌরোহিত্য করেন সমিতির সভাপতি অধ্যাপক শ্রীপতি রঞ্জন চৌধুরী। স্বাগতিক উপসমিতির আহবায়ক ড. অসীম কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধান অতিথির হাতে মনোজ্ঞ স্বাগতিকটি তুলে দিলে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বাগতিক প্রকাশিত হয়। সভার শুরুতে সফদর হাসমির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

সংগৃহীত নানা অনুষ্ঠান, বক্তৃতা, নাটক, পুতুলনাচ, কবি সম্মেলন, লোক সংস্কৃতি, বিচিত্রানুষ্ঠান, ক্রীড়ানুষ্ঠান, প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে উৎসব উদযাপিত হয়। স্কুলের সাধারণ সম্পাদক মুশান্ত হালদার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এখবর জানিয়েছেন।

জেলা প্রশাসনিক ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন

গত ১৩ অক্টোবর '৮৮ নদীয়া জেলার নবনির্মিত জেলা প্রশাসন ভবনটির দ্বারোদ্ঘাটন করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি, ভূমি রাজস্ব ও পঞ্চায়েত দপ্তরের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী। ভবনটি নির্মাণে প্রশাসনিক অফিসের কাজ কর্মের সুবিধা হল।

মৃত্যু বার্ষিকী

তরুণ কবি রঞ্জন ভট্টাচার্যের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী গত ২৩.১১.৮৮ ফুলিয়া গ্রাম্য পাঠাগারে একটি স্মরণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালন করেন কবির বন্ধুরা।

জেলায় স্বল্পব্যয়ে শৌচাগার নির্মাণ

গত ২৯শে সেপ্টেম্বর বামুন পুকুরে 'এরা কে' ক্লাবের উদ্যোগে নদীয়া জেলায় সর্বপ্রথম স্বল্পব্যয়ে গ্রামীণ শৌচাগার প্রকল্পের শুভ উদ্বোধন করেন নদীয়া জেলা সমাহর্তা শ্রীপ্রসন্ন কুমার প্রধান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রকল্প আধিকারিক শ্রীশান্তনু সিন্‌হা, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনাথায়ণ চন্দ্র বসু, জেলা সমাজ কল্যাণ আধিকারিক শ্রীসুদর্শন ভট্টাচার্য, শ্রীদশরথ বিশ্বাস, শ্রীস্বপন ভট্টাচার্য প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করতে গিয়ে জেলা সমাহর্তা শ্রীপ্রধান এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং প্রশাসনিক সহায়তার প্রতিশ্রুতি দেন।

শান্তিসমিতির অনন্য নজির

১০ নভেম্বর '৮৮ রাণাঘাট মহকুমার কালীপুর—দলুয়াবাড়ি স্কুল প্রাঙ্গণে শান্তি সমিতির তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উৎসব বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্র (অসামরিক প্রতিরক্ষা) বিভাগ, শ্রীসৈয়দ ওয়াহেদ রেজা সমিতির তৃতাংপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে এখানকার মানুষের উপর যে অশুভ চক্র অত্যাচার ও নির্যাতন করছিল তার বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে গঠিত এই শান্তি সমিতি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বুকে এক অগুচ্ছ নজির সৃষ্টি করেছে। অগাধদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন জেলা পরিষদের স্থানীয় সদস্য শ্রীমতি মনু দেব, নদীয়া জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক শ্রীনারায়ণ

চন্দ্র বসু, রাণাঘাট থানার ভারপ্রাপ্ত ইনস্পেক্টার ত্রিনিতা গোপাল সেন, শান্তি সমিতির সভাপতি শ্রীপুলিনবিহারী বাইন, সম্পাদক শ্রীসত্য রঞ্জন সবকার, সহ-সভাপতি শ্রীকুদ্দুস আলী মণ্ডল প্রমুখ। এই উপলক্ষে ১০৫ খানা গ্রামের প্রায় দশ হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে।

টানাপোড়েন-এর বার্ষিক সাহিত্য বাসর

গত ১৯/১১/৮৮ অগ্ন্যাগ্ন বছরের মত এবাবেও 'টানাপোড়েন' পত্রিকার বার্ষিক সাহিত্য বাসর বসে সমিতির অফিসে। অনুষ্ঠানে ভাষণ, আলোচনা, কবিতা পাঠের পর টানাপোড়েন-এর লেখকদের বই উপহার দেন পত্রিকা গোষ্ঠী। টানাপোড়েন অষ্টম বর্ষে পা দিল।

সমবায় সপ্তাহ

সমবায় সপ্তাহ উপলক্ষে ফুলিয়ার ৩টি সমিতি—ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প সমিতি, টাঙ্গাইল তন্তুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি এবং ফুলিয়া তন্তুবায় সমবায় সমিতি গত ১৮-২০ নভেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় সপ্তাহ পালন করে।

আনন্দনগরে নৌকা নির্মাণ কেন্দ্র

গত ২৯/১২/৮৮ আনন্দনগর ফিসারমেন্স কোঃ অপারেটিভ সোসাইটির উদ্যোগে আড়ংঘাটার কাছে আনন্দনগরে জাল তৈরীর মেশিন ও একটি নৌকা নির্মাণ কেন্দ্রের উদ্বোধন হয়।

হরিদাস স্মরণোৎসব

যখন হরিদাসের সাধন পীঠ ফুলিয়ায় (কবি কুন্তিবাসের জন্মভিটে সংলগ্ন) হরিদাসের স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হয় গত ১৪-১-৮৯। উৎসব উপলক্ষে কীর্তন, পথ পরিক্রমা, দরিদ্র ভোজন হয়। প্রচুর লোক সমাগম হয় এই অনুষ্ঠানে।

সাহিত্যসৈকত/জানুঃ-মার্চ '৮৯

বিদ্যানিকেতন শিশুবিহারের ক্রীড়ানুষ্ঠান

উষাগ্রামে বিদ্যানিকেতন শিশুবিহারের ছোট, ছোট ছেলে মেয়েরা তাদের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান করে গত ২৪ ১২-৮৮ স্কুল প্রাঙ্গণে। ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দিতে বহু অভিভাবক/অভিভাবিকার সঙ্গে বিশিষ্ট অতিথিবর্গও উপস্থিত ছিলেন। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পরিচালনায় 'রসনা কুঞ্জের' আহার এবার অনেকের জিভকেই বহু সময় ধরে রসান্বিত করে রেখেছে বলে জানা গেল।

আনন্দ নিকেতন শিশুবিহারের বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান

ফুলিয়া সমবায় সদনে অবস্থিত আনন্দ নিকেতন শিশুবিহার তাদের ৬ষ্ঠ বর্ষ বার্ষিক ক্রীড়ানুষ্ঠান পালন করে গত ২২-১-৮৯ জনরঞ্জন কেন্দ্রের সম্মুখস্থ খোলা মাঠে। সকাল থেকে সন্ধ্যা অবধি ছোট ছোট প্রায় শ' দেড়েক ছেলে মেয়ে বিভিন্ন ধরনের ৩৯টি খেলায় অংশ গ্রহণ করে উপস্থিত দর্শকদের আনন্দ দেয়। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারাও খেলায় অংশ গ্রহণ করেন।

পরিবেশ দূষণ অভিযান

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর উদ্যোগে এবং নদীয়া জেলা পরিষদের ব্যবস্থাপনায় গত ১৬ই জানুয়ারী '৮৯ কৃষ্ণনগরে পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রণ দিবস পালিত হয়।

সকালে কৃষ্ণনগরে বিভিন্ন প্রাস্ত থেকে প্রায় ২০০০ শিশুর এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ট্যাবলোসহ শহর পরিক্রমা করে রবীন্দ্রভবনে জমায়েত হয়। এই শিশু পদযাত্রায় নেতৃত্বে অগ্গাণ্দের মধ্যে ছিলেন নদীয়া জেলা পরিষদের সভাপতিত্ব শ্রীপরিমল বাগচী, পঃ বঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের উপদেষ্টা শ্রীঅবরগি ভূষণ বসু।

হুপুরে কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে পরিবেশ দূষণ ও নিয়ন্ত্রণ শীর্ষক এক মনোজ্ঞ আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব সাহিত্য সৈকত/জানুঃ-মার্চ '৮৯

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের মতন সাবস্টেশন

গত ৪ ফেব্রুয়ারী নদীয়া জেলার নাকাশিপাড়া অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রামে পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ৩৩/১১ কে.ভি.নতুন একটি সাব স্টেশন উদ্বোধন করেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী শ্রীপ্রবীর সেনগুপ্ত। এর ফলে ঐ এলাকায় ভোল্টেজের সমস্যা মিটবে বলে আশা করা যায়।

ঐ দিনই বেথুয়াডহরীর কাছে যুগপুর গ্রামে ৮টি বাড়িতে লোকদীপের আলো জ্বলে দেন মন্ত্রী মহাশয়।

পেনসনার্স এ্যাসোসিয়েশন

গত ২৯ জানুয়ারী ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট পেনসনার্স এ্যাসোসিয়েশনের (ফুলিয়া শাখার) অষ্টম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্রে। সভায় প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শ্রী অধীর কুমার মিত্র ও শ্রী হৃদয়কেশ গাঙ্গুলী। সভায় বিভিন্ন দাবী-দাবা নিয়ে আলোচনা হয়। শ্রীগণেশ রায় ১৯৮৯ সালের জন্যে সম্পাদক হিসাবে পুনঃনির্বাচিত হন।

টেঙ্গটাইল লাইসেন্স নবীকরণ

কলিকাতার ডিরেক্টর অফ টেঙ্গটাইলস এবং জেলাগুলিতে সাব ডিভিশনাল কন্ট্রোলার ফুড এণ্ড সাপ্লাইজ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক ইস্যু করা টেঙ্গটাইল লাইসেন্সের বৈধতার মেয়াদ ৩১-৩-৮৯ তারিখে শেষ হচ্ছে বলে জানান হয়েছে। টেঙ্গটাইল লাইসেন্স গ্রহীতারা যেন ১-২-৮৯ তারিখ থেকে ৩১-৩-৮৯ তারিখের মধ্যে তাঁদের লাইসেন্স রিনিউ করে অন্যথায় লাইসেন্স তামাদি হয়ে যাবে এবং তাঁদের নির্ধারিত কি দিয়ে নতুন লাইসেন্স নিতে হবে। জেলার টেঙ্গটাইল লাইসেন্স গ্রহীতাদের সংশ্লিষ্ট সাবডিভিশনাল কন্ট্রোলার ফুড এণ্ড সাপ্লাইজ-এর অফিস থেকে নবীকরণের দরখাস্ত করম সংগ্রহ করতে হবে বলে জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক (নদীয়া) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন।

শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির দ্বারোদ্ঘাটন

গত ৩১শে জানুয়ারী ফুলিয়া উপনগরীতে শান্তিপুর পঞ্চায়েত সমিতির নব নির্মিত দোতলা বাড়িটির আনুষ্ঠানিক দ্বারোদ্ঘাটন করেন নদীয়া জেলার জেলা শাসক শ্রীপ্রসন্ন কুমার প্রধান।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রানাঘাটের মহকুমা শাসক শ্রীমুজীন্দ্র হালদার, জেলা গ্রামাঞ্চল প্রকল্প আধিকারিক শ্রীশান্তনু সিনহা, শান্তিপুর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীরঞ্জন দাস, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীসঞ্জয় দাসগুপ্ত প্রমুখ।

বাড়িটি নির্মাণে মোট ৪,৭৫,০০০.০০ টাকা ব্যয় হয়।

পুষ্প প্রদর্শনী ও মেলা

গত ২৬ জানুয়ারী '৮৯ থেকে ২ ফেব্রুয়ারী '৮৯ পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বগুলা প্রগতি সম্বের পরিচালনায় বগুলা শ্রীকৃষ্ণ কলেজ ময়দানে পুষ্প, শিশু, কৃষি অঙ্কন ও আবুভি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং মেলা বসে। প্রচুর লোক সমাগম হয়।

ইউ. বি. আই-এর ঋণ আদায়

গত ২০শে জানুয়ারী '৮৯ ইউ. বি. আই. (মাজদিয়া শাখা) আদিত্যপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এক ঋণআদায় শিবিরের আয়োজন করেন। প্রায় ৬১০০০.০০ টাকা আদায় হয়। এ দিন ২৯১ জন ঋণ গ্রহীতা তাঁদের ঋণের টাকা সম্পূর্ণ বা আংশিক ফেরৎ দেন। এই উপলক্ষে একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন নদীয়া জেলার জেলা শাসক শ্রীপ্রসন্ন কুমার প্রধান।

শীতের মরশুমে-
টান্ধাইল শাড়ীর
বিপুল সম্ভার
দেখতে হলে
আসুন

শাড়ো কুঠির

প্রোঃ ননী গোপাল দাস

ফুলিয়া বাসস্ট্যাণ্ড, চটকাতলা, নদীয়া।

ফোন-বাড়ী: ফুলিয়া-৩৮

অফিস: ফুলিয়া-৩৯

আমাদের কলকাতা বিক্রয় কেন্দ্র

বালিগঞ্জ কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪২-৮৩৮৭

সম্পাদকীয়

কুন্তিবাস ও হরিদাস

একটু ভিটে। বাস করে গেছেন পাশাপাশি ছুই মহাপুরুষ। কারো সঙ্গে কারো দেখা হয়নি জীবদ্দশায়। একজনের জন্ম ভিটে। অল্পজনের সাধন স্থল। একজন কবি,- কুল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ। অল্পজন সাধক,—যবন। এঁরা হলেন কুন্তিবাস আর হরিদাস।

কুন্তিবাস জন্মছিলেন ফুলিয়ার মাটিতে বনমালী ওয়ার ঘরে আর হরিদাসের জন্ম পূর্ববঙ্গে খানউল্লা কাকির ঘরে। মুসলমানের ছেলে ‘হরিদাস’ করতে করতে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল বেনাপোলের বনে। বন বাদাড় ঘুরে ঘুরে হরিদাস একদিন ফুলিয়ায় কবির গৃহকোণেই গড়ে তুললেন আপন সাধনপীঠ। কবি তখন আর বেঁচে নেই। এই কুন্তিবাস এবং এই হরিদাস এখন বৎসরান্তে স্মরণীত হন ফুলিয়ার ভিটেতে। ভক্তও ভিন্ন ভিন্ন।

মহাকবির আখ্যা পেয়েও যে কবি ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ তাঁকে নিয়ে ভক্তের দলের টানাটানি আজকের নয়। বহু বিদগ্ধ পণ্ডিতের গবেষণার আকর এই নীরব কবি, বহু কবির প্রাণের আরাম এই কবি, বহু কর্মীর আত্মশুধ এই কবি। নীরব কবি যে নীরবেই বেঁচে আছেন মানুষের অন্তর ছুঁয়ে শতাব্দী হতে শতাব্দী পেরিয়ে, ভক্তের দল তা বুঝেও বুঝতে চাননা। কুন্তিবাসকে বাঁচিয়ে রাখতে চান তাঁরা নিজেরা। কার থেকে কে বেশি ভক্ত তা নিয়েও যে গোপনে গোপনে প্রতিযোগিতা চলে না তাও নয়। কিন্তু পৃথিবীতে কেউ কি কাউকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে, যদি না তাব বাঁচার মত আপন শক্তি না থাকে! কুন্তিবাস বা হরিদাস যে মৃত্যুর পর আজও বেঁচে আছেন তা তাঁদের আপন কীর্তির জগ্গেই ভক্তের বাৎসরিক ছ’ একদিনের উৎসব উদ্‌যাপনের জগ্গে নয়।

স্মরণ উৎসব অনুষ্ঠানকে আমরা এতটুকু অশ্রদ্ধা বা অবজ্ঞা করছি না। এর পেছনেও তো কিছু মানুষের উৎসাহ উদ্বীপনা, নিরলস শ্রম, ভাললাগা ও ভালবাসা জড়িয়ে রয়েছে। এই ভালবাসার ব্যাপারটা আছে বলেই কোথাও কোথাও কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। একটা জিনিসই শুধু স্মরণে রাখা। বিখ্যাত কাউকে স্মরণ করতে গিয়ে আমরা যেন আবার তাঁকে উপলক্ষ্য স্বয়ং নিষ্কামবই প্রচার করে না বসি।

বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন

বিদ্যুৎ সংযোগের জগৎ নেমে আসছে অন্ধকার।
 অপেক্ষমান হাজার হাজার পশ্চিমবঙ্গে যখন বিদ্যুৎ
 আবেদনকারীকে বঞ্চিত করে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থার
 এক শ্রেণীর লোক অবৈধভাবে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে তখন শুর্ত
 বিদ্যুৎ চুরি করে চলেছে হুকিং-বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বানচাল
 ও ট্যাপিং করে। ফলে করে দিতে এক শ্রেণীর সমাজ
 গ্রাহকের ঘরে জ্বলছে না বিরোধী সক্রিয়। বিদ্যুৎ
 আলো। প্রয়োজনের অতি-চুরির মোকাবিলা করুন,
 রিজক চাপ সহ্য করতে না বিদ্যুৎ চোরের বিরুদ্ধে সর্বত্র
 পেরে জ্বলে যাচ্ছে ট্রান্স-প্রতিরোধ গড়ে তুলুন।
 ফরমার। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে

বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরো কঠিন
 এবং জামিনের অযোগ্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ
 পশ্চিমবঙ্গের জীবনের অংশীদার

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
 প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
 মুদ্রণ : মায়ী প্রেস, কাঁকিনাড়া, ২৪ পরগণা।

মহি মহত

বর্ষ ৮ □ সংখ্যা ৩ □ এপ্রিল-জুন ১৯৮৯

এ সংখ্যার সূচি

নদীয়ার কবি (সম্পাদকীয়)	:	
কবি নজরুল ও সাময়িক পত্র	:	শীরানন্দ রায় ৩
এবারে প্রাস্তিকে যাই		
(নদীয়া জেলার তরুণ কবি)	:	মাধব ভট্টাচার্য ৭
পথের শেষ কোথায়	:	ঈশান মিশ্র ১২
রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিনের		
উৎসব ও তাঁর ভাগ্নী সরলাদেবী	:	কাকলি ভট্টাচার্য ১৫
বাতাস (কবিতা)	:	অপন রায় ১৯
বই পত্র পত্রিকা সমালোচনা	:	২০
টুকরো খবর	:	২৪

আমাদের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে

এখন ফুলিয়া রেল স্টেশনের আরও কাছে আনুন

স

ম

বা

য়

স দ নে

ফুলিয়া টাঙ্গাইল শাড়ী বয়ন শিল্প

সমবায় সমিতি লিঃ

★ ★ ★

টাঙ্গাইল তন্তুজীষী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

২৫শ বৈশাখ

দেশের যে অতি ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি বিদ্যা ধন মাল, সেই
শতকরা পাঁচ পরিমাণ-লোকের সঙ্গে পঁচানব্বই
পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের
ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা
এক দেশে আছি, অথচ
আমাদের দেশ
এক নয়।

পল্লীসেবা পল্লীপ্রকৃতি পৃঃ ৬৫-৬৬

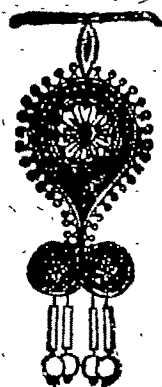
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ৩। ৮২-২০ আই. এণ্ড সি. এ.।

নদীয়া, তারিখ—২/৫/৮২

ফুলিয়ার একমাত্র অভিজাত
স্বর্ণশিল্প প্রতিষ্ঠান

এ, টি, জুয়েলাস'



ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেঘাট, বদায়ী
(মাছ বাজারের সন্নিহিত)

-: আমাদের বিশেষত্ব :-

কম সোনার গহনা, জড়োয়া অলংকার তৈরী, ডিজাইনে
বতুমত ও গ্রহরত্নের সরবরাহকারী

প্রো:- শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার

● ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গহনার কথা ভাবলেই

এ, টি, জুয়েলাসে'র কথা ভাববেনই।

বিঃ দ্রঃ-প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিন বন্ধ থাকে।

কবি নজরুল ও সাময়িক পত্র

ধীরেন্দ্র রায়

চুরুলিয়ার প্রতিবেশীরা একসময়ে তাঁকে জানত—‘হুখুমি’য়া’ নামে। ছেলেটি যে কাজী বংশেরই শেষ কুলপ্রদীপ—এ পরিচয় তাঁর ঢাকা পড়ে গিয়েছিল দুঃসহ দারিজ্যের আচ্ছাদনে। এই দারিজ্যই তাঁকে ঠেলে নিয়ে যায় রুটির দোকানের নোকরিতে। কিন্তু না। সেখানকার পরিবেশ তাঁর সইল না। অল্প সংস্থানে যেতে হল লেটোর দলে। এইখানেই কিন্তু তাঁর সারস্বত জীবনের সূত্রপাত।

লেটোর দলে গান শিখে, আর তাতে সুরারোপ করেই হুখুমি’য়ার ‘কাজী’ পরিচয় প্রকাশ পেল। আর সেটা বিস্তৃত হয়ে ‘নজরুল ইসলাম’—এ উজ্জ্বল হল পরবর্তী অধ্যায়ে, সাময়িক পত্র-পত্রিকারই কল্যাণে।

নজরুলের বয়স তখন ১৮/১৯ হবে। ৪৯ নং বাঙ্গালী রেজি-মেন্টের কোম্পাটার মাস্টার হাবিলদার হিসেবে—করাচিতে ‘লেফট-রাইট’ করছেন। আর পাঠাচ্ছেন কবিতা ও গল্প বাঙ্গালী পাঠকদের জন্য কলকাতায় সাময়িক পত্র-পত্রিকার দফতরে। সম্ভবত ১৯১৮ সালেই তাঁর নাম ছাপার অঙ্করে প্রকাশ পায় বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ‘মোসলেম ভারত’-এর স্তম্ভে। এরই পৃষ্ঠায় প্রথম প্রকাশ পায় তাঁর ‘মুক্তি’ কবিতা। ‘হেনা’ ও ‘ব্যথার দান’ গল্প। পরে ‘তহমিনা’ অর্থাৎ ‘বাধন-হারার’ রচনাটিও এই পত্রিকার কল্যাণেই আলো দেখে। এ প্রসঙ্গে আবার একটু পরেই আসছি। তার আগে, প্রেস সম্পর্কে সামান্য কিছু প্রাথমিক ভণ্ড পরিবেশন করি।

পঞ্চদশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানিতে গুটেনবার্গের ছাপা-

মে দিবাসের আশ্বান

যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তির স্বপক্ষে গণতন্ত্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও
অর্জিত অধিকার রক্ষার সংগ্রামে, স্বৈরতন্ত্র,
বিচ্ছিন্নতাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার
প্রতিরোধে, শ্রমিক কর্মচারী
ও মেহনতী মানুষের দৃঢ়
ঐক্য গড়ে তুলুন ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ২। ৮৯-৯০ আই. এণ্ড সি. এ.।

নদীয়া, তারিখ-৪/৫/৮৯

খান। চালু হবার পর চিন্তা ও ভাব সঞ্চালনের জগতে তা এক তুমুল বিপ্লব ঘটায়। আর তারই ধারা ভারতের মাটিতে এসে পৌঁছায় কোম্পানির আমলে, উইলকিন্স আর পঞ্চানন কর্মকারের কর্মকুশলতায়।

মুদ্রায়ত্ত্ব, মনোভূমিকে কর্ষণযোগ্য করে তুলল এখানেও। আর এদেশে প্রেসের পত্তনের পর, এমন কোন রুচিবান, কর্ষিত কেউই ছিলেন না, যার সঙ্গে সাময়িক সংবাদপত্রের সম্পর্ক গড়ে না উঠেছে। কথাটা মধুসূদন-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-সুকান্ত পর্যন্ত সমানভাবে, সকলের উপর প্রযোজ্য।

এঁরা সকলেই, জীবনের কোন না কোন পর্বে সাময়িক পত্রের ওপরেই নির্ভর করেছেন, আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে।

মধুসূদন নির্ভর করেছিলেন লিটারেরি গ্রীনারের ওপর, কখনো বা মাদ্রাজ সাকুলেটার, স্পেক্টেটার অথবা হিন্দু পেট্রিয়টে। বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল, ‘বঙ্গদর্শন’ রবীন্দ্রনাথের—‘সাধনা’ তেমনই নজরুলের ছিল—‘নবযুগ’। অবশ্য এর সঙ্গে আরও ছুটি সাময়িক পত্র, ‘লাঙল’ আর ‘ধূমকেতু’র কথাও উল্লেখ করতে হয়। তবে ‘নবযুগের’ সঙ্গে তাঁর সান্নিধ্য বিশেষভাবে অর্ন্তব্য এই কারণে যে ‘নবযুগে কাজ করার সময়ে, নজরুলের কবিপ্রতিভা আশ্চর্যরূপে বিকশিত হয়েছিল, এখানে দুই নজরুলের সমন্বয় ঘটেছিল’-কবি ও স্বাধীনতা যুদ্ধের এই নির্ভীক সেনানীর।

(দ্র: মুজফ্ফর আহমদ—স্মৃতিকথা পৃ: ২৪)

ফজলুল হকের এই সাক্ষ্য দৈনিক নবযুগ, যখন প্রভাতী পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে নজরুলের সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় আমার ঘটে সেই কালটাতেই। সেই পত্রিকার দফতরেই সম্ভবত। লোয়ার সাকুলার রোডের, লরেটো স্কুলের পাশে একটি বাড়িতে ছিল নব যুগের অফিস। সম্পাদক নজরুলের

সম্পাদকীয় বেরুত কবিতায়। দু-কলম ভর্তি পাইকায় ছাপানো
কাব্যে সম্পাদকীয় বোধহয় নজরুল ছাড়া এ যুগে আর কেউই
লেখেননি।

সে যাক। প্রথম দিনের সাক্ষাতের কথাই বলি। দেখলাম,
নজরুল ইসলাম ওখানে বসে আছেন। জনপরিবৃত্ত। প্রায়
সবার কাছেই তিনি ‘কাজীদা’। মাথায় খদরের গান্ধী টুপি।
গাঢ় লাল রঙের ছোবানো। লম্বা চুল, কান ঢেকে ঘাড়ের ওপর
লভানো। গায়ে সাদা পাঞ্জাবি। তার ওপরে গেরুয়া চাদর,
কোমরের ডান দিক থেকে আড়াআড়ি বাঁ কাঁধের ওপর ফেলা।
পায়ে চপ্পল। মুখের মধ্যে প্রথমেই নজরে এসেছিল পুরু জ্বর
নিচে এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। জীবনানন্দের ভাষায়, এখন
যাকে বলা যায়—‘পাখির নীড়ের মত’! উত্তাপ, আহ্বান আর
নিশ্চিত আশ্রয়, এরই স্পর্শ পেয়েছিলাম সেদিন। দৃষ্টি নেমে
এসেছিল ঠোঁটে। ঈষৎ স্থূল অধরোষ্ঠ, তাম্বুল রঞ্জিত।

ঠিক শুঁড়িয়ে রলা যাবে না, তবু যেন দুই বিরোধের সহাবস্থান
প্রত্যক্ষ করেছিলাম, কবির আদিক অস্তিত্বে। যেমন বিরোধ
ছিল, লালাটুপি আর গেরুয়া চাদরে, তেমনি তা ছিল তার
চোখে আর ঠোঁটে। কেন জানি না—হঠাৎ মনে এসেছিল,
ছবিতে দেখা, মাইকেল মধুসূদনের সেই অতি পরিচিত মুখ,
তেমনই উজ্জ্বল চোখ, স্থূল ঠোঁট। সাহেবী পোষাক আর
বাঙালী গাত্রবর্ণ, দুই বিরোধ, যেন একে এসে মিলেছিল।

নজরুল প্রসঙ্গে মধুসূদনের কথা মনে আসে এই কারণে, যে
আধুনিক বাংলা কাব্য বিকাশের ঘুর্ণি সিঁড়ির প্রথম পাকের,
প্রথম ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন মধুসূদন আর দ্বিতীয় ধাপের
সমাস্তরালে আছেন কাজী নজরুল। দুটি ক্ষেত্রেই সমানবেগ
আর সমান ব্যর্থতা। সমভাবে সমাদৃত আর একই রূপে উপ-
ক্ষিত। স্থান-কালের দূরত্বে তাই কাব্যের মহাকাশে ওঁরা যেন
(এরপর ২৮ পৃষ্ঠায়)

নন্দীয়া জেলার তরুণ কবি

এবারে প্রান্তিকে ঘাই

মাধব ভট্টাচার্য

হাট বসেছিল সেদিন। মরা শীতের শেষ বিকেলে রোববারে।
কৃষ্টিবাসের হাট। দিন-দুপুরে বড় বড় সওদা হয়ে গেলে সাঁঝ
বিকেলে আসর জমিয়েছিল ক্ষ্যাপা তরুণের দল। কবিতার
আসর। বিনে পয়সার বিকিকিনি। কে নিবি কত নে! শব্দের
ফুলে গাঁথা মালা কে পরবি গলে পর!

শুধুই কি শব্দের ফুল! তরুণ কবি যে তার সব দিয়ে নিঃশ্ব
হতে চায়। কিন্তু কে নেবে এতসব?

বছরে একদিনই আসে ওরা এখানে, এই কৃষ্টিবাসের হাটে
হয়তো বা বিনা নিমন্ত্রণেই। অনামী অখ্যাত কবিকে কে দেবে
আসন পেতে। কেউ ফিরেও তাকায় না। ওরা অবশ্য অনাগত
কি অভ্যাগত তার তোয়াক্কাই করে না। ওদের আসন পাতা যে
মানুষের হৃদয়ে হৃদয়ে। মহাকবির নিঃশব্দ ডাকে মহীরুহের
ছায়াতলে এসে ওরা দাঁড়ায় ভাবুক হ'চোখ মেলে। ও চোখে যে
কত ছবি ধরা পড়ে তার কি সব বলা সম্ভব!

এমনি আরও কত আসরই তো বসে বছর জুড়ে এখানে
ওখানে। ছলাং ছলাং দাঁড় টেনে ভর দুপুরে চুর্ণী নদীতে কবির
নৌকা ভাসে কখনও বা পূর্ণিমা রাতে খোলা মাঠে কখনও বা
ছুটির সকালে ঘরের আলসেতে বাঁতাবি তলায়। ফুলের সুগন্ধ
শব্দের সুগন্ধর সঙ্গে মিতালী পাতায়।

ক'দিন পরে জেলার তরুণ কবির মিলে ২১ ফেব্রুয়ারী স্মরণ
করবে। আসছে পঁচিশে বৈশাখ ওদের ক্ষের দেখা হওয়ার কথা
আছে “কবিতা কুটির”।

ফলকে সেদিন দেখেছিলাম রানাঘাটের এক কবিতা পাঠের

আসরে। খবরের কাগজের পাতায় লাল কালিতে একটা কবিতা লিখে নিয়ে এসেছিল সে। তাই পড়লো। রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে তার মাথায় যখন কবিতা জন্ম নেয়, হাতের কাছে যা পায় তাতেই সে তাকে শুইয়ে দেয়।

এবারে কৃষ্ণিবাসের হাট জমেনি ভাল। জয় আসেনি। দেবদাস, সুবোধ, মল্লিকা, তরুণ, প্রাণেশ—এরাও ত এলো না! জয়ের শরীর ভাল আছে তো! বারা এসেছিলেন তারা বলাবলি করছিলেন এসব।

দিনকল্প আগে কার্তিকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। রেল স্টেশনের প্ল্যাটফরমে। কাঁধে ঝোলা। ঝোলা ভর্তি কবিতা। ঝোলা থেকে কবিতার খাতা বের করে সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই একটা কবিতা পড়ে শুনিয়ে দিল সে আমাকে। সদ্য লেখা। নামকরণও বোধ করি হয়নি তখনও। বর্ধমানের কোন এক সাহিত্য সভাতে কবিতাটা পাঠ করে এই ফিরছে। কার্তিক বললো কবিতাটা শুনে কোন এক ভদ্রমহিলা নাকি উঠে এসে তার হাত ধরেছিলেন। কে জানে কী যাত্র ছিল কার্তিকের কবিতায়!

কার্তিক বলছিল, ওর কবিতার সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে গেছে। বইও বেরিয়েছে। কার্তিক মোদক তাঁর কবিতার ঝোলা নিয়ে ঘুরে বেড়ান এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত।

জয় অনেকটা একাকী আত্মমুখী। স্থির মৌন। ওর কবিতায় প্রগলভতা নেই আছে গভীরতা। শূন্য ঘরে গভীর রাতে জয়কে বলে উঠতে দেখি, ‘আমি যে ঘুমোই, জানি, তুমি ঠিক এসে দাঁড়াবেই শিরের কাছে। আরো জানি, তুমি ওই দুটি জানালা প্রথম খুলে দেবে ধীরে ধীরে।’

জয় জানে কার সম্মোহনে কোথায় সে যাচ্ছে—কোথায় তার চরাচর। জয় গোশ্বামীর চারটে কবিতার বই বেরিয়ে গেছে।

দেবদাস আচার্য-রও বই বেরিয়েছে গোটা চারেক। রথীন

ভৌমিকের ছ'টো। কবিতা ছাড়া সাহিত্যের অন্য-স্বরেও-দেব-
দাসের আসা-যাওয়া আছে-দেবদাস-তার কবিতায় কখনও
কখনও ফর্ম-ভাঙ্গেন। গল্পের খালাতে কবিতাকে বেড়ে-দেন
পাঠকের কাছে।

সুবোধ-মল্লিকারও বই বেরিয়েছে। এখন তো-ওরা অভিন্ন
হৃদয়। “সোহাগ-শর্ববী” ওদের আছে, পিঠে বেধে রেখেছে।

নিজের দে-চৌধুরী কেন-যে অনেকদিন লিখছেন না এ-কৌতুহল
সবারই। না, লিখছেন ঠিকই। প্রেমসীকে বোধ-করি-ঘর ছাড়া
করতে চাইছেন না-এই অশাস্ত পরিবেশে।

“স্বাধীন-সূর্য” প্রকাশের পর-তরুণ-গোস্বামীর আর-কোন বই
না-বেরুলেও কবিতা-লেখায়-বিরাম-নেই। বিরাম-নেই
বিবেকানন্দ-সেন-আর-রামপ্রসাদ-মুখোপাধ্যায়েরও। শ্রোত
বইছে-নারায়ণ-নীলাঞ্জন-ও-শতঞ্জীবের-কলমে।

চন্দন-মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-স্বচ্ছন্দ-সুন্দর। কবিতার
শরীরের-ভাজে-ভাজে-লেপটে-রয়েছে-তঁাক-মন। তবু-মুখ-তুলে
তিনি বলেন-“অজ্ঞ-ও-জানিনা-আমি, ভালো-বাসা-ঠিক-কাকে
বলে।”

“জন্ম” কবিতার-জন্ম-দিতে-দিতে-তপন-বলছিলেন-“আমায়
দেখে-না-কেউ-আমি-দেখি-তোমাদের-ভিতরে-বাইরে। আমায়
চেনে-না-কেউ, আমি-চিনি-সকলের-পরিচয়-জন্ম, জন্ম-ধরে।”—
নিজের-পকেটের-পয়সা-খরচ-করেই-তপন-ভট্টাচার্য-একটা-কবি-
তার-বই-বের-করেছেন-কিছুকাল-আগে।

প্রাণেশ-সরকারের-কোন-বই-বেরয়নি-এখনও। কিন্তু-অসংখ্য
লিটল-ম্যাগাজিনের-পাতা-উপছে-পড়েছে-তার-লেখা-কবিতায়।
প্রাণেশের-কবিতা-বেড়ে-স্তূঠে-চৈতন্যের-শেকড়-ছুঁয়ে-ধীরে-ধীরে
আত্মপোলন্ড্রির-ফসলে। সুধীর-চক্রবর্তীর-সুখ-লিটল-ম্যাগাজিনের
পাতা-ভরিয়েই। গরীবের-ঘরেই-তিনি-আত্মীয়তা-করতে-চান

কিছু মমতা কিছু ভালোবাসায় ।

কবিতার বিছানায় শুয়ে আছেন আরও অনেকেই । রামকৃষ্ণ দে, জয়নাল আবেদীন, জাবের আলি, বিপাশ কুরি, দেবব্রত পাল, আশোক দত্ত, শ্রামল, সুভাষ, ভবতোষ, প্রশান্ত, শঙ্কু, উৎপল, পুষ্পেন্দু আরও যে কত সবাইকে কী আর চিনি ।

ইদানীং গৌরাজ ভট্টাচার্য আর অনন্তমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু ছড়া লিখেই মন ভরাচ্ছেন । কিশোরী শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর রায়, স্বপন মোদক, পবিত্র বসু, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, বিপ্লব মৈত্র, অনিল ঘড়াই, হরিপদ, মিকটু মুখার্জী এরা গল্পই লেখেন বেশি । গল্প লিখলেই বা কী গোপনে গোপনে কী একটা করিতারও জন্ম হয়নি এদের ঘরে এও কী হতে পারে !

স্বপন রায় কবিতার নীরব প্রেমিক । তাঁর “তথাপি সপ্তর্ষি” তাঁকে উদ্ভাপ দিয়েছে খানিকটা ।

ব্রততীও লিখছেন । সংসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে গভীর রাতে সংগোপনে কবিতার শিয়রে মাথা পেতে শোয় আরতি । সারা-দিনের ঝড়, ক্লান্তি, স্বাদ-বিস্বাদ নিয়ে তিনি আশ্রয় খোঁজেন কবিতার শরীরে । পঙ্কু অসিত হাজরারও আজ একমাত্র আশ্রয় কবিতা ।

বাসবী কি কবিতা লেখা ছেড়ে দিল নাকি ?-কে যেন সেদিন তাঁকে খুব করে খুঁজছিল ।

চুর্ণী, জলঙ্গী, ইছামতী, ভাগীরথীর পলি মাথা নদীয়ার মাটিতে মহাকবি থেকে অখ্যাত অনামী কত কবি যে জন্মেছেন কত কবির ঘর যে আজও ছড়িয়ে আছে নদীর পারে, বাঁশ বাগানের তলে বন শিউলির ছায়ায় তাদের সকলের ছয়ায় তো আজও যাওয়া হয়ে ওঠেনি ।

চুর্ণীর পূর্ব পারে ঝাউ বীথিতলে দেখা হয়েছিল এক কিশোরীর সঙ্গে । আটপোরে কিশোরী মেয়েটি একটা কবিতা শুনিয়েছিল ।

কবিতাটা আজও মনে আছে ।

অনেকদিনের পরে যখন আমি
হারিয়ে যাবো
এই সবুজ পাতা, ফুলের রাশি
অন্ত সুরে কইবে কথা
জেনো, তোমার কাছেই আমি আছি
তোমার ভুবন জুড়ে
তোমার অনেক কাছাকাছি ।

আটপৌরে এই মেয়েটির ছোট্ট খাতা ভরে আছে কবিতায়
আর ছবিতে । কোথাও ছাপা হয়নি । কবিতা শুনিয়েই মেয়েটি
পালিয়ে গেছিল । পরিচয় জানা হয়নি ।

কার ভুবন আলো করে আছে যে মেয়েটি, কাকেই বা ফেলে
রেখে চলে যাবার ভয়ে ম্লান মুখ বাড়ায়, এসব কিছুই জানা
হয়নি আমার । কেউ কি তার খবর নেবে না ?

এ মাটির কাছাকাছি আরও যে কত কবির ছয়া-হয়নি
আজও যাওয়া, হয়নি পরিচয়, হয়নি তাদের কবিতা শোনা—
তাদের ঠিকানা কী পাব না কোন একদিন !

সৌজা : কলকাতা (রবিবাসর)

১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৯

পথের শেষ কোথায়

ঈশ্বর ঘিষ

রবীন্দ্র দৃষ্টিতে গভীর হৃৎকের মাঝে হৃদয়ের অন্তত আনন্দাত্ম-
ভূতি স্বভাবতই মনে রেখাপাত করে। তাই বুঝি
রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনে বহুবিধ হৃৎক-মৃত্যুশোক গানের
ক্ষেত্রে এমনভাবে সমৃদ্ধশালী করতে বিশেষ সহায়তা করেছে।
তার হৃৎকের গান গাইতে বিশেষভাবে মনের মাঝে যে ভাবের
এক নিঃশব্দ আলোড়ন হয় তা তার অন্য কোনো গানে তেমন
করে বুঝি হয় না। কিসের যেন এক ব্যাপ্তি এই গানের মাঝে
রয়েছে যা মনকে উদাস করে দিচ্ছেও আনন্দের পরিপূর্ণ এক
জগতে তাকে দাঁড় করায়, উপলব্ধি করায় নব নব রূপে। হৃৎকের
প্রতি আমাদের মর্ষাদাবোধ খুবই গভীর কেন তা জানি না।
তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের কথাই বলি—“হৃৎকের তীব্র উপলব্ধিও
আনন্দকর, কেন না সেটা নিবিড় অস্তিত্বসূচক,.....হৃৎকে
আমাদের স্পষ্ট করে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা
থাকতে দেয় না। গভীর হৃৎক ভূমা, ট্র্যাঞ্জেলির মতো সেই ভূমা
আছে-সেই ভূমৈব সুখম্।

হৃৎকের গান রবীন্দ্রনাথের কলম দিয়ে বহু লেখা হয়েছে এবং
তা বিশেষ ভাবে মনকে প্রভাবিত করেছেও বলতে হবে। তবে
এই গান কিন্তু ব্যক্তিগত হৃৎকের ভাবযুক্তি নয় এর আবেদন সর্ব
জাগতিক। আত্মবেদনা যেন সর্বজনীন বেদনা হ'য়ে ধরা পড়েছে
তার গানে। ‘সকল জন্ম ভরে’ ও ‘মোর দরদিয়া, কাঁদি কাঁদাই
তোরে ও মোর দরদিয়া’ -এই বোধ অন্তরের কোন্ অন্তঃস্থল
থেকে যেন উৎসারিত। প্রেমের গভীরতা যেখানে তার পরিমাপ
খুঁজে পায়না কাঁদিয়ে কেঁদেই যেন তার সবকিছু সুখ-আনন্দ।

এর অল্পভূতি প্রত্যেকের মনের যেন বিশেষ এক আবেদন সর্ব-
জনীন আকুলতা-তোমার মনের মতনটি হতে পারিনি বলে
তোমাকে দুঃখ দিই কাঁদাই, অপর পক্ষে ঈশ্বর, তুমি আমার
মনের মতো হও না বলে গভীর দুঃখ। মানুষের মনের এই
সহজ সরল চিন্তাধারা চিরন্তন কিন্তু এমন সুন্দর সুমধুর ক'রে
রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে এর রূপ দিয়েছেন যে মাঝে মাঝে মনে
হয় আমাদের প্রত্যেকের মনের এক কোমল পবিত্র স্থানের
গোপন খবর কেমন করে পৌঁছলো তাঁর কাছে। ‘কিছুই তো
হ’ল না। সেইসব-সেইসব-সেই হাহাকার রব, সেই অশ্রুবারি
ধারা হৃদয় বেদনা।’ এ হাহাকার রব বন্ধুকে বুকের মাঝে
পেয়েও। মিলনের মাঝে বেদন সানাই হয় তো মধুর গভীরতম
ভাবে আপাতভাবে আমরা বুঝতে পারি না।

ব্যক্তিগত জীবনে কবি বহু কষ্ট মানসিক যন্ত্রণার সম্মুখীন
হয়েছেন। পত্নীর মৃত্যু, পুত্র কল্লার স্নেহ বন্ধন ছিন্নের শোক,
বোঠানের ইহলোক ত্যাগ সবকিছুই রবীন্দ্রনাথের গান পাগল
মনটিকে আরও উদার আর সন্নিবিষ্ট করেছে-গভীর দুঃখে ও তাঁর
সব হারানোর ছায়ার মাঝে ফুটে উঠেছে এক তীব্র অল্পভূতি যা
ভুলিয়ে দিয়েছে তাঁর দুঃখ, কষ্ট সকলের মত করে এই চিন্তা
ভাবনায় তিনি মগ্ন হয়ে নিজে দুঃখ আনন্দের খেয়া তরীকে
এক করে ভেবে নিয়েছেন।

‘সহসা দারুন দুঃখ তাপে সকল ভুবন যবে কাঁপে,

সকল পথের ঘোচে চিহ্ন সকল বাঁধন যবে ছিন্ন

মৃত্যু আঘাত লাগে প্রাণে’

তোমার পরশ আসে কখন কে জানে ॥

মানব জীবনে খোঁজার শেষ নেই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা
কতখানি বিস্তৃত তা বোঝায় তাঁর গানের কথায়-‘তোমায় নতুন
ক’রে পাবো বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণ, ও মোর ভালবাসার ধন।’

হৃৎধের কাতরোক্তি তাঁর বহু গানে ছড়িয়ে রয়েছে—

আর রেখোনা অঁধারে

আমায় দেখতে দাও ।

স্বপ্নভারে জমল বোঝা, চিরজীবন শূন্য খোঁজা

যে মোর আলো লুকিয়ে আছে রাতের পারে

আমায় দেখতে দাও ।

যে আলোর অত্যন্ত রশ্মিও দেখা যাচ্ছে না তাকেই চেয়েছেন নিজের কামনাকে উজাড় করে । রবীন্দ্রনাথের শূন্য খোঁজাকে আমরা কোন্ ব্যাপক আকৃতির সামিল করতে পারি তা জানি না ।

তাঁর অশ্রু ভরা বেদনা দিকে দিকে বাজে, ‘তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়’ কিংবা ‘পথের শেষ কোথায় শেষ কোথায়, কী আছে শেষে’ এই সমস্ত গানগুলি বিভিন্ন সময়ের লেখা গভীর আত্ম-চেতনার এক সূক্ষ্মতম রূপ । বারেবারেই তো মনে হয় এর কথা তো আমার নিজের কথা । সত্যিই তো—রবীন্দ্রনাথ আমাদের সবার—আমরা তাঁর চিন্তাধারার ।

তাঁর গানে কোথায় কি যেন না পাবার এক ছুঁবার আকাঙ্ক্ষা বারে বারে ঘুরে ফিরে এসেছে—আনন্দের সামিল হ’তে চেয়েছে মনে প্রাণে—সর্বশ্রেষ্ঠ কোনো আত্মদানের উন্মুখ মন গেয়ে উঠেছে—

সকলি নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে

মন সরে না যেতে ফেলিলে একি দায়ে

কঁদালে তুমি মোরে ভালবাসারি ঘায়ে ।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জন্মদিনের উৎসব ও তাঁর ভাগ্নী সরলাদেবী

কাকলি ভট্টাচার্য

২৫শে বৈশাখ আসে কি বছর নতুন রূপে। আমাদের প্রাণের মাঝে সাড়া জাগে। মনে মনে তৈরী হই এই শুভ দিনটিকে বরণ করার জন্ত। এইভাবে আমাদের প্রিয় কবির বয়স বাড়ে ধীরে ধীরে। কবিগুরুর জন্মদিন উপলক্ষ্যে সেদিন আমরা রবিপূজা করি, তাঁরই লেখা গান, আবৃত্তি, নৃত্যনাট্য দিবে তাকেই স্মরণ করি। এরপরেও প্রায় মাসাধিককাল চলতে থাকে ২৫শে বৈশাখকে স্মরণ করে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠান।

বাঙ্গালীর বারমাসের তেরপার্বণের সঙ্গে এও আর এক পার্বণ যুক্ত আমাদের একান্ত আপন করে। আমাদের সমস্ত চেতনা জুড়ে বিছিয়ে রয়েছে সে আনন্দ। নববর্ষের ঠিক পরেই আসবে ২৫শে বৈশাখ, কবিগুরুর জন্মদিন। চলতে থাকে প্রস্তুতি-পাড়ায়, ক্লাবে, স্কুলে, বাংলার বাইরে এমন কি বিদেশেও তাঁর সমারোহ—

হে নূতন দেখা দিক আরবার

জন্মের পরম শুভক্ষণ

ধ্বনিত হতে থাকে গা শিরশির করা সুরেলা কোরাস। ২৫শে বৈশাখের এই শুভ দিনটিকে প্রথম স্মরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী সরলাদেবী।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী বিলাত থেকে ফিরে এসে বিদেশীদের দেখাদেখি নিজের ছেলে মেয়ে ইন্দিরী ও সুরেন্দ্রনাথের জন্মদিন পালন করতে শুরু করেন। সে সময় সীমিত কিছু পরিবার ছাড়া এখনকার মত বাঙ্গালীদের ঘরে ঘরে জন্মদিন পালন রীতি এত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল না।

এরপরে এল সেই পুণ্য দিন ২৫শে বৈশাখ। স্বর্ণকুমারী দেবীর ছোট মেয়ে অল্পবয়সী সরলা সেদিন খুব ভোরবেলা উঠে খুতি-চাদর ফুলমালা নিয়ে হাজির হলেন জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ির সেই নির্দিষ্ট ঘরে। রবিমামা তখন ঘুমাচ্ছেন, তাঁকে জাগিয়ে প্রণাম করে সরলা স্মরণ করালেন সেদিন তাঁর জন্মদিন। রবীন্দ্রনাথ হয়ত সেদিন মনে মনে কৌতুক অনুভব করে থাকবেন ভাগ্নীর এই কাণ্ডকারখানা দেখে। কিন্তু এরপর থেকে সবাই সচেতন হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালিত হয়ে আসছে প্রতি বছর নির্দিষ্ট নিয়মে।

রবীন্দ্রনাথের দিদির মেয়ে সরলার জন্ম জোড়াসাঁকোয় মামার বাড়িতে। শিশু বয়সে তাঁর বাবা বিদেশে থাকার ফলে প্রথম পড়াশোনাও তাঁর শুরু হয় সেখানেই। ঠাকুর বাড়ির পরিবেশ তখন সমস্ত দিক থেকেই জমজমাট। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ঊনবিংশ শতকে এই বাংলার সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র ছিল এই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। কি ভাষা, শিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য প্রভৃতি বহু বিষয়ে। অপরদিকে সরলার বাবা জ্ঞানকীনাথ ঘোষাল ছিলেন নদীয়া জেলার জয়রামপুরের জমিদার বংশের ছেলে। স্বাভাবিক কারণেই সরলা উভয় দিক থেকে পেয়েছিলেন তেজস্বিতা, সাহসিকতা এবং সঙ্গীত, শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি অম্লরাগ। এসব কারণে তাঁর রবিমামা তাঁকে খুবই স্নেহ করতেন, এবং উৎসাহ দিতেন সবসময়।

সরলার ছিল বহুমুখী প্রতিভা। খুব ছোটবেলা থেকেই তাঁর পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছিল ওস্তাদের কাছে সঙ্গীত-চর্চা। গান ছাড়াও তিনি পিয়ানো, বীণা, বেহালা ইত্যাদি বাজনা বাজাতে পারতেন। ক্রমে তিনি দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতে যথেষ্ট পারদর্শিনী হয়ে ওঠেন। পরবর্তীকালে একাধারে তিনি গায়িকা, সঙ্গীতকার, ও সুরকার হিসেবে অসাধারণ কৃতিত্বের

পরিচয় দিয়েছিলেন। সরলার অন্যান্য গুণাবলী বাদ দিলেও কেবলমাত্র সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন।

এই প্রতিভাময়ী মহিলা রবীন্দ্রনাথের সুর সাধনায় রীতিমত সহায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা ‘নিঝরের স্বপ্নভঙ্গ’ কে সরলা পিয়ানোর সুরে রূপ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কিছু গানও তিনি বিদেশী গায়ন রীতিতে এবং সুরে রূপান্তরিত করেছিলেন। ‘বন্দে মাতরম্’ গানের প্রথমার্ধ সুর দিয়েছিলেন কবিগুরু নিজে এবং শেষের দিকের অংশটুকুতে সরলা প্রথম অংশটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সুর বসিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই অনুরোধে। তখনকার দিনে কলকাতায় প্রথম সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল সরলারই চেষ্টায়। অনেক অভিজাত বংশের ছেলে মেয়েরা সেখানে সঙ্গীত শিক্ষা করতে আসতেন।

বিয়ের আগে সরলাদেবী কিছুদিন মহীশূরে চাকরী করেছিলেন। বিয়ের পরেও তিনি বহু জায়গা ঘুরেছেন। রবীন্দ্রনাথ সরলার কাছ থেকে মহীশূরী ভজন, বাউলগান, বাংলার লোক-গীতি; দক্ষিণী গান ইত্যাদি শুনে সেইসব সুরের অনুকরণে তাঁর নিজের লেখা গানে বিচিত্র সুর সম্পদে সমৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, গুরুদেব তাঁর অজস্র গানের মধ্যে বেশ কিছু গান বেঁধেছিলেন কোন হঠাৎ দেখা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা তাঁর পরিচিত কাউকে উদ্দেশ্য করে। যেমন—‘আমার সোনার হরিণ চাই’, ‘আমি চিনি গো চিনি তোমারে’, ‘ওগো তুমি পঞ্চদশী’ কিংবা ‘আজ শ্রাবণের পূর্ণিমাতে’ ইত্যাদি। কবিগুরুর গানের কথায় এবং পরদে পরদে যেন যাত্রার মায়াজাল বিছানো, সে সুরের বরণা কখনও গম্ভীর কখনও বা উচ্ছল।

সরলাদেবী প্রবন্ধ-গল্প লেখার সঙ্গে সঙ্গে অনেক গানও লিখে-

ছিলেন। তাঁর লেখা বেশির ভাগ কবিতা ও গান দেশাত্মবোধক। বন্দেমাতরম্ বীজমস্ত্রে সরলাও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন মনে প্রাণে। পরাধীন দেশবাসীকে স্বাধীন চেতনায় ফিরিয়ে আনাই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তিনি যে সময় ‘ভারতীর’ সম্পাদিকা ছিলেন সে সময় গান ও বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে দেশবাসীকে স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেষ্টা করেছিলেন। স্বদেশভিত্তিক এবং অস্ত্রান্ত্র একশোটি গান নিয়ে ‘শতগান’ নামে তাঁর একটি স্বর-লিপির বই প্রকাশিত হয়েছিল।

বি. এ. পাশ করার পর সরলা সাহিত্য চর্চায় বেশি করে মনোনিবেশ করেন। এই সময় বন্ধিমচন্দ্র তাঁর লেখা পড়ে খুবই প্রশংসা করেছিলেন। আর রবি মামাতো তাঁর প্রতিটি কাজে তাঁকে অনুপ্রেরণা যোগাতেন। রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে সরলার সঙ্গীত ও সাহিত্যের অঙ্ক ভঙ্ক ছিলেন।

একদিন কমবয়সী একটা মেয়ে ভোরবেলা সবাইকে চমকে দিয়ে আপন খেয়ালে ধুতি-চাদর ফুলের মালায় তার পরম আত্মীয় রবিমামাকে যত্ন সহকারে সাজিয়ে দিয়ে বলেছিল— ‘আজ তোমার জন্মদিন।’ এরপর বহু বছর কেটে গেছে। ২৫শে বৈশাখের উৎসব আর ঘরের কোণে সীমাবদ্ধ হয়ে নেই। সেই কিশোরীও বৃদ্ধা হয়েছে।

১৩৪৮ এর ২৫শে বৈশাখের জন্মোৎসবে সেই ভাস্বর জ্যোতিষ্ক টের পেয়েছিলেন পৃথিবীর খেলাঘরে এটাই তাঁর শেষ জন্মদিন পালনের সমারোহ চলছে। তাই তিনি লিখলেন—

‘আমার এ জন্মদিন মাঝে আমি হারা

আমি চাই বন্ধুজন যারা

তাহাদের হাতের পরশে

মর্ত্যের অন্তিম প্রীতি রসে

নিষে যাব জীবনের চরম প্রসাদ

নিষে যাব মানুষের শেষ আশীর্বাদ।

শূণ্য বুলি আজিকে আমার ;
 দিগ্বেছি উজ্জাড় করি
 যাহা কিছু আছিল দিবার,
 প্রতিদানে যদি কিছু পাই—
 কিছু স্নেহ কিছু কমা—
 তবে তাহা সঙ্গে নিয়ে যাই
 পারের খেয়ায় যাব যবে
 জাযাহীন শেষের উৎসবে ।’

বাতাস

স্বপন রায়

ছুচোখে আজ রাত্রি নেই
 সাতটি সাঁঝের পিদিম জ্বলে
 তিন ভুবনের ছয়ের খুলে
 গল্প বলে হারিয়ে গ্যাছে যে জন, তারও
 ঘুম পাড়ানি কষ্ট নেই

বাইরে দহন দহন ঘরে
 জ্বলন্ত চুল্লীর
 অসহ্য আঁচ । বাতাস কেনে
 ফুল করে তুললি !

বই পত্র পত্রিকা আলোচনা

কবি নবীন চন্দ্র সেন : জীবন ও সাহিত্য

সম্পাদনা : রবীন্দ্র গুপ্ত

কবি মিলন স্মৃতি উৎসব উদযাপন সমিতি

রানাঘাট, নদীয়া। পনেরো টাকা।

ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কবি নবীনচন্দ্রকে ঘিরে বিভিন্ন সময়ে লেখা ছোট বড় প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থ এটি। অবশ্য ছ'টো কবিতার সঙ্গে ছ' একটা নতুন লেখাও সংযোজিত হয়েছে। প্রকাশনার উদ্যোগ রানাঘাটের কবি মিলন স্মৃতি উৎসব উদযাপন সমিতি। কবির স্মৃতিকে নব প্রজন্মের মনে গেঁথে দেবার শুল্ক প্রয়াস।

যে কবির জন্ম ভিটে চট্টগ্রামে তাঁর পক্ষে রানাঘাটবাসী বৃহদয় জয় করে নেবার বড় কারণ শুধু যে মহকুমা শাসক হিসাবে রানাঘাটে তাঁর ছ'বছরের বাস তাই নয়, বোধ করি রানাঘাটের বাংলাতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মিলনই বড় কথা।

এটা ঠিক, নবীনচন্দ্রের বড় পরিচয় তিনি কবি, তারপরে প্রশাসক। তবে তাঁর কাব্য জীবনের সঙ্গে প্রশাসক জীবনের ভূমিকাও বড় কম নয়। তাঁর লেখা 'অবকাশ রসতনী'; 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতক', 'কুরুক্ষেত্র' বাংলা সাহিত্যের, বিশেষ করে এই শতকের গোড়ার দিকের পাঠকরা কে না পড়েছেন!

তবে একজন কবি যখন প্রশাসক হিসাবে মানুষের কাছে উপস্থাপিত হন তখন তাঁর কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা থাকে একটু ভিন্নতর। আলোচ্য গ্রন্থটিতে যে সমস্ত রচনা সংকলিত হয়েছে তার অধিকাংশই প্রশাসক নবীনচন্দ্রের উপর আলোকপাত। কারো কারো রচনায় কবির ব্যক্তি জীবনের ছোট খোট কোঁতুলোদ্দীপক ঘটনা উঠে এসেছে। গিরিজানাথ মুখোপা-

খ্যায় লিখেছেন—রেল স্টেশনে কবির সঙ্গে তার কি করে পরিচয় হলো,—একটা কবিতা লিখে তাঁর সঙ্গে কি করে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়।—এর পরে তো একেবারে ঘরের মানুষ। এরকম আরো টুকরে টুকরো ঘটনার উল্লেখ করেছেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র সেন, প্রমুখ তাঁদের লেখায়। কবির কাব্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টি-কোণ থেকে মূল্যবান আলোচনা করেছেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ রমা চৌধুরী, বগলা মোহন দাশগুপ্ত, সনৎ কুমার বাগচী, রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি লেখকগণ।

চাকুরী জীবনে নবীনচন্দ্র ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ১৮৬৮ থেকে ১৯০৪ এই ৩৬ বছরের চাকুরী জীবনে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি। তাঁর ডেপুটিগিরির কাজে কখনও কখনও উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের প্রশংসা জুটেছে যেমন, তেমন আবার নিন্দাবাদও কম নয়। “পলাশীর যুদ্ধ” লিখে তো বৃটিশ রাজ্যের বিরূপভাজন হতে হয়েছিল তাঁকে।

বইটিতে প্রশাসক নবীনচন্দ্রের বহুমুখী কাজকর্মের একটি তথ্যনিষ্ঠ অথচ সুখপাঠ্য চিত্র তুলে ধরেছেন নবীনচন্দ্রেরই স্থলাভিষিক্ত ইদানীং কালের আর এক তরুণ প্রশাসক কান্তপ্রসাদ সিনহা তাঁর লেখা প্রশাসনে নবীনচন্দ্র সেন প্রবন্ধে। নিজের কাকাকে এক মোকদমা থেকে বাঁচাতে গিয়ে নবীনচন্দ্রের নিজেরই চাকরীতে ছেদ, ‘পলাশীর যুদ্ধ’ লিখে রাজদ্রোহীতার অভিযোগ, সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করতে গিয়ে নিজে সরকারের সলহভাজন হওয়া এরকম প্রচুর ঘটনার বিবরণের সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় তাঁর উন্নয়ন মূলক ও জনহিতকর কাজেরও উল্লেখ রয়েছে কান্তপ্রসাদের লেখা বইটিতে।

বইটিতে নবীনচন্দ্র চাকুরী জীবনের কখন কোথায় অতিবাহিত করেছেন এবং তাঁর সম্পর্কে উর্দ্ধতন কতৃপক্ষের ভালমন্দ নোটও

লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ গুলো ব্যক্তি এবং প্রশাসক নবীনচন্দ্রকে
জ্ঞানার পক্ষে মূল্যবান তথ্য।

প্রশাসক নবীনচন্দ্র সম্পর্কে আরও একটি লেখা রয়েছে
মুক্তীধর হালদারের। স্মরণ আচার্য তাঁর লেখায় রানাঘাটে
নবীনচন্দ্রের বাংলায় রবীন্দ্রনাথের আসা এবং দুই কবির
মিলনের মুহূর্তটিকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন। দুই কবির
এই মিলন দিনটি আজও যে রানাঘাট মহকুমা শাসকের
বাংলায় মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয় তারও উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া শেষে কেশবলাল চক্রবর্তী ও অমিতা চট্টোপাধ্যায়ের
নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থপঞ্জী—বইটির মূল্য অনেকাংশে বাড়িয়ে
দিয়েছে। বইটি গবেষক পাঠকের কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে
উঠবে বলেই আশা করছি। তা সত্ত্বেও বলব সম্পাদনার ক্ষেত্রে
যন্ত্রের অভাব, ছাপার ভুল, নিম্নমানের কাগজ ও বাঁধাই,
প্রকাশকের নামের গায়ে চিরকুট আটানো—এসব ভয়ঙ্করই
ছাপ।

অগ্নিকীট

তপন ভট্টাচার্য, ফুলিয়া, বেলমাঠ
নদীয়া।

ছোট ছোট মোট ছাব্বিশটা কবিতার সমাহার এই অগ্নিকীট
কাব্য। প্রত্যেক কবিতার আলাদা কোন নাম নেই। কবি
সমস্ত কবিতাগুলিকে অগ্নিকীটের একটা সূতোয় গেঁথেছেন শক্ত
করে গদ্য কবিতা। ছন্দ আছে এবং এতে কিছু সংস্কৃত শব্দের
সংমিশ্রণও ঘটেছে মাঝে মাঝে। কবিতাগুলি পড়তে ভাল
লাগে। ছাপা ভাল, কিন্তু কিছু কিছু কবিতায় মুদ্রণ প্রমাদে
চোখ ঠেকে যায়।

মর্মতরঙ্গ

কবিশুন্দর অমিয় কুমার পাল,
৬৫২ জি. টি. রোড, (কালীতলা)
শ্রীরামপুর, হুগলী।

মর্মতরঙ্গ পুরোপুরি একটি শোক গাথা। কবি তাঁর একমাত্র ছেলেকে অকালে হারিয়ে এই কবিতাগুলির মধ্য দিয়েই নাস্তানা খুঁজেছেন। মর্মতরঙ্গ কাব্যটিকে মোট আটটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে। ভুল, নৈরাশ্র, খেলা, জীবন মাধুর্য, আলোক, অমৃত ও শরণ। মর্মতরঙ্গের মর্মস্পর্শী কবিতাগুলি পড়তে পড়তে মনটা ব্যথায় ছলে ওঠে। কবি তাঁর প্রায় সমস্ত কবিতায় জীবন ও মৃত্যুর পাশাপাশি সহাবস্থানের বিভিন্ন রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন সুন্দর-সহজ-সরল ভাষায়। এবং তাঁর প্রাণের আর্তিই হল এই কাব্যের প্রধান অঙ্গসজ্জা। এত দুঃখেও কবি ঈশ্বরের বিশ্বাস হারাননি, বরং ঈশ্বরেই তিনি তাঁর সমস্ত ব্যথা আকুলতা সমর্পণ করেছেন নিঃস্বার্থভাবে। এই পার্থিব জগতে সব হারিয়ে কবি নিঃস্ব হলেও ঈশ্বরকে তিনি পেয়েছেন তাঁর অন্তরে, এই হল মর্মতরঙ্গের প্রতিটি কবিতার শেষ কথা।

ভিন্ন কোরাস

প্রকাশক—সনৎ মার্না, হাটখোলা, দয়ের ধার,
চন্দননগর, হুগলী।

দশজন তরুণ লেখকের স্বনির্বাচিত দশটি গল্পে ভিন্ন কোরাসের আত্মপ্রকাশ। দশটি গল্প প্রত্যেকটিই ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের। বর্তমান সমাজের এক এক রকম রূপ ফুটে উঠেছে এদের প্রত্যেকের মধ্যে। সব গল্পগুলি তেমন ধারালো না হলেও গৌর-বৈরাগীর লেখা সেরিবার গল্পে পুরাতনের মধ্যে এক নতুনকে

আবিষ্কার করার আনন্দ পাওয়া যায়। আশিস ভট্টাচার্যের দেশলাই গল্পটি জীবন যন্ত্রণার বাস্তব চিত্রকে তুলে ধরেছে প্রকটভাবে। শতভ্রম মজুমদারের চোরখরার গল্প লেখাটি নিত্য বাস্তবের ঘটনাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ ছাড়াও অতীন চট্টোপাধ্যায়, অশোক চট্টোপাধ্যায়, গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ মিত্র, বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়, ও সুদর্শন দত্ত ভিন্ন ভিন্ন কোরাসের লেখক নুচীতে আছেন।

—কাঃ ভঃ

টুকরো খবর

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

সমবায় কৃষি ঋণের একটা বিরাট অংশ এখনও পর্যাস্ত অনাদায়ী রয়েছে। ফলে সমবায় ব্যাংকগুলি সভ্য কৃষকদের চাহিদা অনুযায়ী ঋণ দিতে পারছে না এবং তার জন্য চাষের কাজ বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

এবারের আমনধানের উৎপাদন অন্যান্য বারের তুলনায় বেশী হয়েছে বলে মনে হয়, 'যদিও ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুরের কিছু অংশে প্রবল ঝড়ের ফলে আমন ফসলের কিছু ক্ষতি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেন যে সব কৃষক সভ্য সমবায় থেকে স্বল্প মেয়াদী, মধ্য মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিয়েছেন তারা যেন সত্তর তাদের ঋণ পরিশোধ করেন এবং নতুন করে ঋণ নিয়ে চাষের কাজ আরম্ভ করেন।

তিনি আরও বলেন সকল সমবায় সভ্যের মনে রাখা উচিত যে সমবায় থেকে দেয় ঋণ মুকুব হয় না। একজন সভ্য ঋণ শোধ না করলে অন্য সভ্যরা ঋণ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন। পঞ্চায়েত সভ্য, কৃষক সংগঠনের সভ্য, সমবায় সমিতির সভ্য এবং স্থানীয় বিধানসভার সভ্যরা যেন এগিয়ে আসেন এবং এই বাবদ আদায়ীকৃত অর্থের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে তুলেন।

ভূমি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

গত ইং ১৮. ২. ৮৯ তারিখ হইতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি সম্পর্কিত দুটি বিভাগ যথা ভূমি জরিপ ও তথ্য সংরক্ষণ এবং ভূমি বটন ও ভূমি ব্যবহার একত্রিত হয়ে একটি স্ব-সংহত বিভাগ গড়ে উঠেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এই একীকরণ নীতি গ্রামীণ জনসাধারণের 'নিকট ভূমি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় সমস্ত কাজ গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে পৌঁছে দেবে। এই পরিকল্পনায় গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে একজন রাজস্ব পরিদর্শক, একজন ভূমি সহায়ক ও একজন জরিপ কর্মচারী থাকবেন। ভূমি রাজস্ব গ্রহণ, ভূমি সম্পর্কিত যাবতীয় কাজকর্মাদি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজস্ব পরিদর্শক মহোদয় দেখাশোনা করবেন। তাঁর এজিয়ার বহির্ভূত কাজের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি দিয়ে তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরে ব্যাপারটি আনবেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে রাজস্ব পরিদর্শক মহাশয় রাজস্ব আধিকারিকের কাজ করবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছেন। গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরের উপরে ব্লক স্তরে একজন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক থাকবেন। তাঁদের অধীনে অন্যান্য কর্মচারী ছাড়াও তিনজন রাজস্ব আধিকারিক থাকবেন। পরবর্তী স্তরে একজন মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক থাকবেন।

নদীয়া জেলা পরিষদ সভাপতি শ্রীপরিমল বাগচী ও জেলা শাসক শ্রীঅসিত বরণ চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত এই বিজ্ঞপ্তিটি প্রচারের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক।

এস কে দে'র স্মরণে শোক সভা

গত ২৯. ৫. ৮৯ ফুলিয়া জনরঞ্জন কেন্দ্রে প্রাক্তন তেল্লীষ সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রী ও ফুলিয়া উপনগরীর রূপকার প্রয়াত এস. কে. দে'র স্মরণে শোক সভা পালিত হয়। স্থানীয় নাগরিকবৃন্দ উপস্থিত থেকে তাঁর প্রতিকৃতিতে মালা দেন এবং শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

প্রসঙ্গত বলা দবকার এস. কে. দে গত ২৭. ৫. ৮৯ দিল্লীতে পরলোক গমন করেন। ফুলিয়া উপনগরটি প্রয়াত দে'র পরিকল্পনা অনুযায়ী তৈরী। এই শহরে তাঁর বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

এস. কে. দে'র জীবন ও কর্ম, ফুলিয়া উপনগরীর সঙ্গে তাঁর স্মৃতি বিজরিত বিভিন্ন ঘটনা প্রভৃতি নিয়ে বক্তব্য রাখেন সর্বশ্রী—গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী, স্থানীয় সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রঞ্জিত কুমার দাস, বেনীমাধব দে, মাধব ভট্টাচার্য, অরুণ ভৌমিক ও গণেশ রায়। সভায় প্রয়াত এস. কে. দে'র স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর নামে শহরের প্রধান রাস্তাটির নামকরণের প্রস্তাব করেন শ্রীগণেশ রায়।

ফুলিয়া পলিটেকনিক

কর্তৃপক্ষের গাফিলতিতে ফুলিয়া পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হতে বসেছে। গত ১৫শে মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরেই দুই দল ছাত্রের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে এবং কয়েকজন আহত হন।

ইনিষ্টিটিউশনের দেওয়াল জুড়ে পোষ্টার পড়ে।

১৯৫০ সালে স্থাপিত এই প্রতিষ্ঠানটি প্রথম দিকে ভোকেশ-
ন্যাল ট্রেনিং সেন্টার ছিল। এক সময় এখান থেকে পাশ করা
ছাত্রদের আই, টি, আই সমতুল্য সার্টিফিকেট দেওয়া হতো বলে
এক মুখপাত্র জানালেন। পরবর্তী সময়ে দু' বছরের কোর্স সং-
কোচিত হয়ে এক বছরের হয়। বহু দিন ধরেই ছাত্রদের দাবী
ছিল প্রতিষ্ঠানটিকে I. T. I. সমতুল্য করার। এই নিয়ে ইতি-
পূর্বে ছাত্র আন্দোলনও হয়েছে। ১৯৭৯ এর ১ জুলাই থেকে
১৯৮২-র ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি কার্যত বন্ধই ছিল। I. T. I
এর প্যাটার্ন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ১৯৮৬ শিক্ষাবর্ষে ইলেকট্রিক 'শিয়ান' ও
ফিটার (২ বছরের শিক্ষাক্রম) এবং মোন্ডার ও ওয়েন্ডার (১
বছরের শিক্ষাক্রম) ট্রেডে ৬৪ জন ছাত্র ভর্তি করা হয়। বাকী
১০টি ট্রেডের মধ্যে দু'টি ট্রেড আপাতত বন্ধ। শিক্ষক নেই।
অন্য ৮টি ট্রেডে ১ পুরনো সার্টিফিকেট কোর্স চলছে।

I. T. I সমতুল্য যে ট্রেডগুলোতে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্র ভর্তি
করা হয়েছিল কতৃপক্ষ এখন জানাচ্ছেন শ্রম দপ্তরের অনুমোদন
পায়নি বলে কোর্সগুলো I. T. I সমতুল্য করা যাচ্ছেনা। এর
ফলেই ছাত্রদের মনে অসন্তোষ জাগে। তারা অফিস সুপারিন-
টেনডেন্টের কাছে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পলিটেকনিকের সুপারিনটেনডেন্ট কুমুদ দাসগুপ্তর কাছে এ
সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন—শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশানু-
যায়ীই (অর্ডার নং ৫২৮/এডু (টি./প) তাং ৮. ১১. ৮৫) তারা
বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ছাত্র ভর্তি করেছিলেন, কিন্তু এতদিনেও শ্রম দপ্ত-
রের স্বীকৃতি না পাওয়াতে সংশ্লিষ্ট ট্রেডগুলোকে I. T. I. সম-
তুল্য করা যাচ্ছে না। কবে হবে এ সম্পর্কেও ছাত্রদের তারা
সঠিক কোন আশ্বাস দিতে পারছেন না। অন্য এক মহলের

খবর মুষ্টিমেয় কয়েকজন শিক্ষক কর্মচারীর স্বার্থ রক্ষার্থেই এ ধরনের টালবাহানা চলছে প্রতিষ্ঠানটিকে নিয়ে এবং ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহল বলছে শ্রম দপ্তরের অধীনে গেলে শিক্ষক কর্মচারীদের চাকুরী ছেদের বয়স সীমা দাঁড়াবে ৫৮ বছর শিক্ষা দপ্তরের অধীনে থাকায় চাকুরী ছেদের বয়সসীমা ৬০। তা ছাড়া I. T. I. সমতুল্য হলে যে আপ-গ্রেডেশন হবে তাতে সংশ্লিষ্ট অনেক শিক্ষকের যোগ্যতার প্রশ্নটিও রয়েছে।

(৬ পৃষ্ঠার পর)

যুগ্ম নক্ষত্র। কর্মে ও ধর্মে তাঁদের সঙ্গতিটা তাই সহজে সবার চোখে পড়ে। এই সঙ্গতি, অল্প কোন অঞ্চলে না হোক, সংবাদ-পত্রের সংযোগে যে তাঁদের জীবনে কিভাবে ফুটে ওঠে, সেটাই দেখা যাক।

মধুসূদন ২৪ বছর বয়সে (১৮৪৮ সালে) হঠাৎ মাদ্রাজে গিয়ে হাজির হন। শিক্ষকতা অবশ্য তাঁর জুটেছিল, কিন্তু তাঁর খ্যাতি ওখানে ছড়ায় সাংবাদিক ও কবি হিসেবে। ‘মাদ্রাজ সাকুলেটার’, ‘আর্থেনিয়াম’, ‘স্পেক্টেটার’—প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি যুক্ত ছিলেন। সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘হিন্দু ক্রনিকল’- সম্পাদনাও তিনি করতেন।

মাদ্রাজ সাকুলেটারের স্তম্ভে, ‘টিমোথি-পেনপোয়েম’—এই ছদ্মনামে,—তাঁর বহু কবিতা ছাপা হয়। আর ক্যাপটিভ লেডী ও ডিসমুস অব দ্য পার্স্ট—এই দুই কাহিনী কাব্য, তাঁর জীবনের স্রোতোধারাটাকেই তো পার্স্টে দেয় বলা যায়।

অন্যদিকে নজরুল যখন প্রবাসে, তখন থেকেই তাঁর সাহিত্য

সাধনার প্রকৃত সূত্রপাত। বয়স তখন তাঁর ডি এদিকে নয় —করাচির সেনা নিবাস থেকে কলকাতার পত্র-পত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখা পাঠাতে থাকেন। মোজাম্মেল হকের মোসলেম ভারতে তাঁর ‘মুক্তি’ কবিতা, হেনা, ব্যথার দান, তহমিনা —বাঁধনহারা প্রভৃতি গল্প কাহিনীও প্রকাশিত হতে থাকে।
 * এমন কি সেই কুড়ি-একুশেই পত্র-পত্রিকার কল্যাণে তাঁর নাম হয়ে যায় ‘বাঁধনহারা-কবি’। কথাগুলো আগেই বলেছি। পুনরুল্লেখ করলাম—এই কারণে যে নজরুল প্রতিভা বিকাশের পথ পায়, সাময়িক পত্রেরই হাত ধরে।

বাস্তালী রেজিমেন্ট ভেঙ্গে গেল, বেকার নজরুল কলকাতায় এলেন। প্রাথমিক আশ্রয় মিলল, তাঁর পরিচিত পত্রিকা দফতরেই। আকজালুল হক তাঁকে আশ্রয় দিলেন। আর সাহচর্য দিলেন মুজাফ্ফর আহম্মদ, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের ঋদ্ধিক কুলের যিনি ছিলেন অগ্রগণ্য।

৫ এঁরা ছ’জনায় মিলে একটার পর একটা পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। কিছুদিন পরপর অর্থাভাবে সেগুলি উঠে গেছে। কিন্তু তাই বলে, তা ব্যর্থ হয়নি। পত্রিকাগুলি মরেছে কিন্তু সেই মৃত্যুর মধ্যেই কবি নজরুলই জেগে উঠেছেন বারে বারে নতুন নতুন জীবনে।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। নজরুল প্রকাশ করেছিলেন ‘ধুমকেতু’। অল্প দামের কাগজ। কিন্তু তাকে দামী করে তোলে, রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ। সেই পত্রিকার শারদ সংখ্যায় —নজরুলের কবিতা বেরুল—‘আগমনী’! সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল ইংরাজ-রাষ্ট্রযন্ত্রের রোষ। কারাদণ্ড হল এক বছরের। কাগজে কবিতা লেখার জন্ম, কারাভোগ সম্ভবত সর্বপ্রথম নজরুলেরই ঘটেছিল। কাগজ অবশ্য উঠে গেল, কিন্তু জনচিন্তে নজরুল যে মশাল জ্বালিয়ে দিলেন তা নিভল না।

এমনতর ঘটনা বহুবার বহু পত্রিকাকে অবলম্বন করেই ঘটেছিল, যা আজ ভারত সংস্কৃতির অচ্ছেদ্য ইতিহাস হয়ে গেছে।

আমার বক্তব্যের চুস্‌কটি এবার গড়া যাক। ছুঁমি'য়ার সারস্বত জীবনের শুরু লেটোর দলে গান লিখে, তাতে সুরারোপ করে। তা বিস্তৃত হল—তঁার প্রবাস জীবনে; সাহিত্য সাময়িকীর চাহিদা মিটিয়ে, কবিতা-গল্প-কাহিনী লিখে। আর সে প্রয়াস পূর্ণতা পেল, স্বয়ং পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব যখন তিনি কাঁধে তুলে নেন। তঁার জীবনের পরম লগ্ন, সাময়িক পত্রের সঙ্গে লগ্ন হওয়ার কালটাতেই এসেছিল—যদিও তাতে তঁার জীবন যন্ত্রণা কণামাত্র কহমনি।

প্রসঙ্গত, আরও একটি কথা বলা দরকার; আধুনিক সংবাদপত্র কেবল সমাচারই বিতরণ করে না; মতবাদও বিকীর্ণ করে। এই ছুঁমির যথাযথ সম্মিলনেই, সংবাদপত্রের প্রাণ পল্লবিত হয়ে ওঠে।

নজরুলের যৌবনে, তঁার সৃষ্টির সমকালে, পরিবেশনযোগ্য সংবাদ অনেকেই ছিল; কিন্তু তার চেয়ে বেশি ছিল, তঁার সংবাদ সৃষ্টি করার মানস সম্পদ। এ সম্পদের তিনি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন।

আজকের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যারা চোখ বুলাচ্ছেন, তাঁরা যদি সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে, নজরুলের এই বিশেষ দানটির কথা ভোলেন; তো তাঁর প্রতি যথার্থ অবিচার করাই হবে।

সৌজন্য : ভারতকথা

সম্পাদকীয়

নদীয়ার কবি

‘সাহিত্য সৈকত’ এর ১৯৮৬ সালের ‘এপ্রিল-জুন’ ও ‘জুলাই-সেপ্টেম্বর’ পর পর দু’টো সংখ্যায় ‘নদীয়ার প্রাচীন কবি’ প্রসঙ্গে আমরা লিখেছিলাম। ১২শ শতাব্দীর ধৌয়িক থেকে শুরু কবে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিমান বিহারী মজুমদার পর্যন্ত আমরা সংক্ষেপে তাঁদের জীবন ও কর্মের আলোচনা করেছি। বর্তমান সংখ্যাটিতে আলোচিত হয়েছে নদীয়ার হাল আমাদের কবিবৃন্দ। একই গল্পের পাতে সব পরিচিত কবিদের সম্পর্কে বলা হয়েছে। যারা লেখালেখি করছেন তাঁদের সকলকেই যে উল্লেখ করা গেছে তা সঠিক কবে বলা সম্ভব নয়। কারণ নাম উল্লিখিত না হয়ে থাকলে তা লেখক বা সম্পাদকের অন্তত হিসাবেই হয়েছে জানবেন, অনিচ্ছায় নয়। অলিখিত লেখক কবিদের সম্পর্কে কেউ প্রামাণ্য তথ্য জানালে পরবর্তী লেখায় তাঁদের সংযোজিত করা যেতে পারে। বর্তমান লেখাটি কলকাতা থেকে প্রকাশিত একটি দৈনিক পত্রিকা ‘কলকাতা’র প্রথম প্রকাশিত হয়। এখানে তার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছে। আমাদের ইচ্ছা ইদানীং কালে এই জেলায় যারা সৃজনশীল লেখায় নিয়োজিত আছেন তাঁদের জীবন ও কর্ম নিয়ে আরো বিস্তারিত ভাবে লেখা এবং ‘সাহিত্য সৈকত’ এর একটি সংখ্যা সম্পূর্ণভাবে তাঁদের উদ্দেশে নিবেদন করা। এ ব্যাপারে জেলার লেখক-কবিদের সহযোগিতা একান্ত ভাবে কাম্য। আমরা আমাদের পরিকল্পনার কথা তাঁদেরকে জানানো তাঁরাও যদি আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার চেষ্টা করেনতো কাজটি ত্বরান্বিত হতে পারে, পারস্পরিক সম্পর্কও গড়ে ওঠা সম্ভব।

বিদ্যুৎ চুরির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গাড়ে তুলুন

বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য "আসছে অধিকার। পশ্চিম-
অপেক্ষমান হাজার হাজার বঙ্গে যখন বিদ্যুৎ
আবেদনকারীকে বঞ্চিত করে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থায়
এক শ্রেণীর লোক অবৈধভাবে প্রভূত উন্নতি ঘটেছে তখন শূন্য
বিদ্যুৎ চুরি করে চলেছে ইকিং বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বানচাল
ও ট্যাপিং করে। ফলে করে দিতে এক শ্রেণীর সমাজ
গ্রাহকের ঘরে জ্বলছে না বিরোধী সক্রিয়। বিদ্যুৎ চুরির
আলো। প্রযোজনের অতি-মোকাবিল। করুন, বিদ্যুৎ
রিজক চাপ সহ্য করতে না পেরে চোরের বিরুদ্ধে সর্বত্র প্রতি-
জ্বল যাচ্ছে ট্রান্সফরমার। রোধ গড়ে তুলুন।
সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নেমে

বিদ্যুৎ চুরির সাজা এখন আরো কঠিন
এবং জামিনের অযোগ্য।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পন্থদ

পশ্চিমবাংলার জীবনের অংশীদার

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য □ প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য
প্রকাশ স্থান : সৈকত সরণী, ফুলিয়া, নদীয়া। ৭৪১৪০২
মুদ্রণ : মায়া প্রেস, কাকিনাড়া, ২৪ পরগণা।



ଅମିତ
ମିତ

ବର୍ଷ ୫ ୦ ମୂଲ୍ୟ ୦ ୫

ଆଗସ୍ତ୍ୟ ୧୫୫୫

ବାଲ୍ୟ
୫୦୫

এ সংখ্যার সূচি

প্রবন্ধ

সেকালের বুদ্ধিজীবী ও স্বদেশ

সাধক : কয়েকটি কথা	: হরপ্রসাদ মিত্র	৪২
স্বপ্ন এবং সত্য	: এস, কে, দে	৭

ফিচার

ফুলিয়া শহরের বুনিসাদটা অনেক

দৃঢ় করে লাগানো হয়েছিল	: এস, কে, দে	ক
ভোলা অনুচিত	: গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী	১১
ফুলিয়া উপনগরী ও দে সাহেব	: গণেশ চন্দ্র রায়	১৪
এস, কে, দেয় চিঠি	: মাধব ভট্টাচার্য	২৩

কবিতা

ঈশান চন্দ্র মিশ্র/কাকলি ভট্টাচার্য/ উজ্জল কুমার মুখোপাধ্যায়
সুজিৎ কুমার রায়/কাশীনাথ সাহা/ তপন ভট্টাচার্য

ধারাবাহিক রচনা

হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে	: ডাঃ হরিশঙ্কর কুণ্ডু	১৫
--------------------------	-----------------------	----

টুকরো খবর

সম্পাদকীয়

প্রচ্ছদ

: বনোয়ারী সাউ

সৌজন্য : মায়াপ্রেস

ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ডাক্তর শিল্পী

রামকিষ্করের

অসাধারণ সৃষ্টিকলাপ পরিচিত

সাঁওতাল পরিবার

(ব্রোঞ্জ রেল্লিকা)

বিধাননগর

বিদ্যুৎ ভবন প্রাক্ষণে প্রতিষ্ঠিত করে কলকাতার
তিনশ বছর পুষ্টি উপলক্ষে পশ্চিম বাংলার
সংস্কৃতি জীবনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ

পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার প্রশাসনের নতুন কাঠামো সম্পর্ক বিজ্ঞপ্তি

এতদিন ভূমি সংস্কার বিভাগের অধীনে জেলা প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে ভূমি সংস্কার শাখা এবং জরিপ ও ভূবাসন শাখার পৃথক পৃথক কার্যালয় ছিল। ভূমি সংস্কার শাখা যেমন রাজস্ব ও সরকারি ঋণ আদায়, উদ্ধৃত্ত জমি বটন, ভাগচাষ মামলার নিষ্পত্তি বাস্তব জমি অধিগ্রহণ আইনে পাট্টা বটন ইত্যাদি কাজের দায়িত্বে ছিল জরিপ ও ভূবাসন শাখা তেমনি জমির স্বত্বলিপি তৈরি, উদ্ধৃত্ত জমি সরকারে স্তব্ধ করা, বর্গীদার ও বাস্তব জমি দখলকারদের নাম লিপিবদ্ধ করা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব ছিল। একই বিভাগের কাজ জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ছুভাগে ভাগ হওয়ার ফলে জমিতে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের বিশেষ করে দরিদ্র বর্গীদার পাট্টা-দার ইত্যাদির অনেক অনুরোধ হচ্ছিল। জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাদের পৃথক পৃথক অফিসে ছোট্টাছুটি করতে হ'ত। তাছাড়া ভূমি সংস্কার শাখার ব্রকস্টরের নীচে কোন অফিস ছিল না। জরিপ ও ভূবাসন শাখারও অধিকাংশ অফিস ছিল ব্রক স্টরে। ফলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের জমি সংক্রান্ত কোন কাজের জন্য অনেক সময় নষ্ট করে ব্রক স্টরের অফিসে যোগাযোগ করতে হ'ত।

গ্রামবাসীদের এসব অনুরোধ বিবেচনা করে এবং ভূমি প্রশাসনকে আরও জনমুখী করার উদ্দেশ্যে জেলার বিভিন্ন স্তরে নিম্নবর্ণিত নূতন অফিসগুলি খোলা হয়েছে :

১) রেভিনিউ ইনস্পেক্টরের অফিস (গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তর) এই অফিসগুলির কাজ হবে বকেয়া স্বত্বলিপি লিখন, জনসাধারণকে চূড়ান্ত স্বত্বলিপি ভিত্তিক তথ্য সরবরাহ। নাম খারিজ, জমির রূপান্তর (CON-VERSION) এবং ভাগ্য চুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় আবেদনের উপর প্রাথমিক তদন্তের দায়িত্ব এই অফিস-^৮

গুলির উপর প্রভাব রয়েছে। তুর্কি, রাগু, সেচ ও সরকারী ও আদায়, বর্গাদারের সার্টিফিকেট এবং সরকারের ক্ষমতা ও বাস্তব ক্ষমির দখলকারদের পাট্টাপ্রদান প্রভৃতি কাজেও এই অফিস সমূহের দায়িত্বের মধ্যে থাকবে।

২) ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিস (ব্লক স্তর) :- এই অফিসগুলির মুখ্য কাজ হবে রেভিনিউ

ইনস্পেক্টরদের কাজের সামগ্রিক তদারকি। তাছাড়া স্বত্বলিপি লিখন, ভূমি সংস্থার এবং ভূমি শাসন সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলাব শুনানি ও নিষ্পত্তি এই অফিস সমূহ থেকে হবে। এই অফিসের মুখ্য আধিকারিক হলেন ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিসার এবং তার সহকারী হলেন তিনজন রেভিনিউ অফিসার।

৩) মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিস (মহকুমা স্তর) :- রেভিনিউ ইনস্পেক্টরদের অফিস

এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিস সমূহের নানাবিধ কাজের তত্ত্বাবধান এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক কাজ এই

অফিসগুলি থেকে সম্পন্ন হবে। এই অফিসের মুখ্য আধিকারিক হলেন মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিসার

৪) জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্থার অফিস (জেলা স্তর) :- জেলার ভূমি প্রশাসনের সামগ্রিক

দায়িত্ব এই অফিসগুলির উপর প্রাপ্ত। অধস্তন অফিসগুলির জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মামলার আপীলের শুনানী

ও নিষ্পত্তি এই অফিস থেকে হবে। এই অফিসের মুখ্য আধিকারিক হলেন জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্থার

অফিসার।

নতুন ব্যবস্থায় গ্রাম-পঞ্চায়েত স্তরে রেভিনিউ ইনস্পেক্টরদের অফিস খোলার ফলে গ্রামবাসীদের তার

ভূমি সংক্রান্ত ব্যাপারে সময় নষ্ট করে ব্লক বা মহকুমা স্তরে যোগাযোগ করার দরকার হবে না। ভূমি সংক্রান্ত

যে কোন ব্যাপারে প্রাথমিক ভাবে রেভিনিউ ইনস্পেক্টরদের অফিসে যোগাযোগ বা আবেদন করলেই চলবে।

আই. সি. এ. ২৭২৪ (৫)। ৮৯ ক্রমিক সংখ্যা ৭। ৮৯-৯০ আই. এ. ও. সি. এ। নদীয়া তাং-১৪. ৬. ৮৯

সাহিত্য সৈকত, জুলাই-সেপ্টেম্বর

বক্রেস্বর তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র রূপায়ণে
আপনিও

দু ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সারা দিয়ে
“বক্রেস্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তহবিল”-এ
অর্থদান করুন !

রাজ্যের উন্নয়ন এবং
আপনার সঞ্চয়ের নিরাপত্তার স্বার্থে
ডাকঘর স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্পে টাকা রাখুন ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ১২।৮৯-৯০ আই. এ-ও. সি. এ। নদীয়া

তাং ১৬-৮-৮৯

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সংস্থা)

৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কয়ার, কলিকাতা-১০

“ডব্লু. বি এস আই সি ক্ষুদ্র শিল্পকে সাহায্য করে,
আর ক্ষুদ্র শিল্পগুলি সাহায্য করে সমগ্র দেশকে।”

পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প নিগম ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের সংগ্রহ ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে ১) তুষ্ণাপ্য কাঁচামাল সংগ্রহ ও এস এস আই ইউনিটগুলিকে বিতরণ। ২) অন্তর কাঠামোগত সুবিধার ব্যবস্থা ৩) এস এস আই ইউনিটগুলিকে বিপণনের ব্যবস্থা ৪) আই আর বি আই-এর ঋণ প্রকল্প অনুসরণে রুগ্ন ক্ষুদ্রায়তন শিল্প ইউনিটগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রকল্প ৫) সরকারী ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শিল্প প্রকল্প গঠন।

এভাবেই রাজ্যের শিল্পউন্নয়ন আর্থিক অগ্রগতি এবং কর্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধিতে এই সংস্থা বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে চলেছে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য যোগাযোগ:—

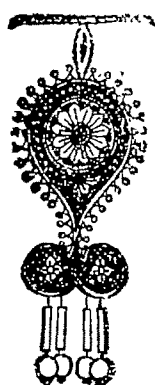
জনসংযোগ আধিকারিক

ফোন নং : ২৭-০৩০৩০৭

ফুলিয়ার একমাত্র অভিজাত স্বর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠান

এ, টি, জুয়েলাস

ফুলিয়া রেল বাজার, বেলেমাঠ, নদীয়া
(মাছ বাজারের সম্মুখ)



শুজোয় বিপুল সম্ভার

আমাদের বিশেষত্ব

কম সোনায় গহনা, জড়োয়া অলংকার তৈরী, ডিজাইনে
নতুনত্ব, গ্রহণাত্মক সরবরাহকারী।

॥ প্রোঃ- শৈলেন্দ্র কুমার কর্মকার ॥

● ফুলিয়ার মানুষ যে কোন গহনার কথা ভাবলেই এ, টি,
জুয়েলাসের কথা ভাবেন।

বিঃ দ্রঃ প্রতি বুধবার আমাদের দোকান সম্পূর্ণ দিবস বন্ধ থাকে।

চিরন্তন ঐতিহ্য

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প

দক্ষতা ও সৌন্দর্যবোধের মিলনের অপর নাম
বাংলার হস্তশিল্প। নিপুণ কারিগরের হাতের
ছোঁয়ায় গড়ে ওঠা বিভিন্ন রুচিসম্মত শিল্পবস্তু।
রয়েছে মনের মতো নানান নকশায় তাঁতের
শাভি, পুরুষ এবং মহিলাদের পোশাকের কাপড়,
বেড়কভার, বেড়শীট, পর্দার কাপড়, চামড়া
ও কাপড়ের ব্যাগ এবং ঘর সাজানোর জন্য
অনেক উপকরণ।

প্রতিবছরের মত এবারও পজার কেনাকাটার
তালিকায় বাংলার হস্তশিল্পজাত সামগ্রীকে
শীর্ষে রাখুন।

বাংলার তাঁত ও হস্তশিল্প : শিল্পীর গৌরব
ক্রেতার রুচির পরিচয় ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ১৪ | ৮৯-৯০ আই. এণ্ড. সি. এ | নদীয়া

তাং ১২-৯-৮৯

প্রাণী-সম্পদ বিকাশ সমাচার

গরু-মহিষের প্রতিষেধক টিকা দেওয়ার নির্ধারিত

টিকার নাম

কোন বয়সে দিতে হবে

১) **ট্রায়ো**

২ মাস, ৬ মাস, ১২ মাস বয়সে। এরপর থেকে ৬ মাস অন্তর বছরে দু'বার করে।

২) **গুটি**

৪ মাস ও ১৮ মাস বয়সে। এরপর থেকে বছরে একবার করে।

৩) **তড়কা**

৮ মাস বয়সে। এরপর থেকে বছরে একবার করে।

৪) **বাদলা**

গলফোলা ৯-১০ মাস বয়সে। এরপর থেকে বছরে একবার করে।

বর্ষা এসে গেছে। এ সময় এসব রোগের সম্ভাবনা প্রবল। এলাকা-ভিত্তিক গরু মহিষের টিকা দেওয়ানোর জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় নিকটবর্তী প্রাণী-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন। মনে রাখবেন, এঁয়ো রোগের টিকা সরকার কর্তৃক ভরতুকী মূল্যে দেওয়া হয়। এই সুযোগ পেতে হলে অবিলম্বে আপনার নিকটবর্তী ব্লক, অতিরিক্ত প্রাণী-স্বাস্থ্য-কেন্দ্র অথবা প্রাণী-বিকাশ সহায়ক কেন্দ্রে আপনার গবাদি প্রাণীর সংখ্যা নথীভুক্ত করান।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ক্রমিক সংখ্যা ১৫। ৮৯-৯০ আই. এ. এ. সি. এ.। নদীয়া

তারিখ ২১-৯-৮৯

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আসন্ন দুর্গাপূজার চাঁদা আদায় করতে এসে যারা জোর-জুলুম করেন, দুর্ব্যবহার করেন, তারা যেমন সাধারণের চোখে অপরাধী, তেমনি আইনের চোখেও সমান অপরাধী। চাঁদা নিতে এসে যদি কেউ আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেন তাহলে আপমি তার প্রতিকারের জন্ত সঙ্গে সঙ্গে নির্ভয়ে এদের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন: ১) স্থানীয় থানার ও.সি, ২) সার্কেল ইন্সপেক্টর বা সি. আই, ৩) মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, বা এস.ডি.পি.ও., ৪) অতিরিক্ত জেলা পুলিশ-সুপার, ৫) জেলা পুলিশ-সুপার, ৬) কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার কন্ট্রোলরুম (ফোন নং : ২৫-৫২০০), (কলকাতা এলাকার জন্ত) ৭) ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল অব পুলিশ, সদর, মহাকরণ, ফোন নং ২৫-৭৬৫৭, ৮) ডিরেক্টর জেনারেল অব পুলিশ, মহাকরণ, ফোন নং : ২৫-৮০৮০।

অভিযোগ পাওয়া মাত্রই পুলিশ অপরাধীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেবে। ইচ্ছে করলে আপনার পরিচয় গোপনও রাখতে পারেন।

ক্রমিক সংখ্যা ১৩৮৯-৯০ আই. এন্ড. সি. এ.। নদীয়া

তাং ৭।৯।৮৯

পূজা ও উৎসব সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি

পৌরসভার এলাকাধীন সর্বসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে পূজা, মহরম, বড়দিন ইত্যাদি যে কোন বারোয়ারী উৎসব ও উৎসবকে কেন্দ্র করে শোভা যাত্রা ইত্যাদির আয়োজন করতে নির্ধারিত আবেদন পত্রে মহকুমা শাসক, ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকের নিকট আবেদন করতে হবে।

আবেদন পত্র স্থানীয় থানা কর্তৃপক্ষের নিকট পাওয়া যাবে। পূজা বা অশ্রু যে কোন উৎসব ও উৎসব কেন্দ্রীক শোভাযাত্রার অনুমতি লওয়া বাধ্যতামূলক।

অনুমতি পত্রে উল্লিখিত শর্তাবলী পূজা বা উৎসব কমিটি বা পরিচালক গোষ্ঠী মানতে বাধ্য থাকবেন।

অনুমোদিত রসিদ বই ছাড়া এবং জোর জুলুম করে টাকা আদায় করা আইনত দণ্ডনীয়। জনস্বার্থের পরিপন্থী যে কোন আচরণ শাস্তি যোগ্য বলে গণ্য হবে।

আরও জানানো যাচ্ছে যে মহকুমা শাসকের বিনা অনুমতিতে যে কোন কারণে যে কোন স্থানে মাইক বাজানো বেআইনি কাজ বলে গণ্য হবে।

নদীয়া জেলা তথা ও সংস্কৃতি আধিকারিক
কর্তৃক প্রচারিত

বৈচিত্র্য ও আধুনিকতায় টাঙ্গাইল শাড়ীর
একমাত্র প্রতিষ্ঠান

বারেন কুমার বসাক

চটকাতলা, ফুলিয়া, নদীয়া।

ফুলিয়া শহরের বুলিয়াদটা অনেক দূঢ় করে লাগানো হয়েছিল

এস. কে. দে

বক্তৃতা দেওয়া বহুদিন ছেড়ে দিয়েছি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর প্রায় ১৬ হাজার বার বক্তৃতা দিয়েছি সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে।

বক্তৃতা দিয়ে যদি ভারতবর্ষকে উন্নত করা যেতো তা হলে মনে হয় এই দেশের মত উন্নতশীল দেশ পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যেতো না। কেননা, বক্তৃতার রাজ্যে পৃথিবীর সব দেশকে আমার মনে হয় আমরা হারাতে পেরেছি। সুতরাং আমি অনেক চিন্তা করে স্থির করলাম যে, না আর বক্তৃতা না! প্রয়োজন হয়, লোকের সাথে বিচার বিনিময় করা। সেটা বক্তৃতা দিয়ে হয় না। ঝট করে বক্তৃতা দেয়া-এটা রোগ হয়ে দাঁড়ায় কেননা, যিনি বক্তৃতা দেন তিনি উপদেশ দিয়ে চলে যান ভাবেন সেই উপদেশগুলো বীজের মতো। তার থেকে ফসল ফলবে। সে হয় না। বিচার বিনিময়ের মাধ্যমে সেটা হওয়া সম্ভব এবং বিচার বিনিময় সব সময় প্রয়োজন।

আপনাদের এখানে কেন এসেছি? শুধু ফুলিয়াতে কী হচ্ছে, ফুলিয়ার লোকেদের সঙ্গে পরিচয় করব নিতান্তই তা নয়। যাদের ৩০/৩১ বছর আগে জানতাম তাঁদের অনেকেই চলে গেছেন।

আমি আমার সমস্ত কাজ ছেড়ে দিয়েছি। বসে বসে লিখি। চিন্তা করি। ভাবি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ চিন্তা করা যদি মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় সেও একটা উপযুক্ত বায়ু মণ্ডল সৃষ্টি করার পক্ষে সহায়ক হয়।

আপনাদের বাংলাদেশের বর্তমান সরকার আমাকে হঠাৎ একেবারে আকস্মিকভাবে অপ্রত্যাশিতভাবে নেমতন্ন পাঠালেন

সাহিত্য সৈকত, জুলাই-সেপ্টেম্বর

যে ওঁরা সরকারী সামর্থ্য, শক্তি, অধিকার যা আছে যতটুকু সম্ভব লোক নিজে পাবে সংগঠিতভাবে নিঃস্বার্থভাবে লোকের হিতের জন্ত চালাবে এইটা সরকার করতে চান।

আশ্চর্য! আজকের পরিস্থিতিতে, পৃথিবীর পরিস্থিতিতে কম্যুনিষ্ট সরকারের তরফ থেকে বঁরা সর্বদা এটা বিশ্বাস করে এসেছেন অতীতে লেনিন যা বলেছেন ভবিষ্যতে সেই লেনিনের কথাতে বিশ্লেষণ করলে তাকে জবাব পাওয়া যাবে, তাদের পক্ষ থেকে এই চিন্তা করা যা এমন একজন লোককে ডাকা দরকার যার এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আছে। কিছু কাজ করার ইচ্ছা আছে, মন আছে একটা গভীর আকাঙ্ক্ষা আছে যার রাজনৈতিক কোক সংস্কার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই সেই লোকটাকে ডেকে বলা তুমি এই বাংলাদেশের কলকাতা থেকে নর্থবেঙ্গল পর্যন্ত যাও, লোকের সঙ্গে কথা বল লোক কী বলছে না বলছে দেখ, লোক কী করছে না করছে দেখ। সরকারী কর্মচারীরা কী করছে! সাহায্য দিচ্ছে না তার মধ্যে বাধা দিচ্ছে এইটা দেখ।—দেখে আমাদের বল তুমি কী দেখলে, কী হচ্ছে এবং তোমার মতে, তোমার অভিজ্ঞতাতে।

আজকের পরিস্থিতিতে ওয়েষ্টবেঙ্গল যেখানে একটা কম্যুনিষ্ট সরকার রাজত্ব করছেন আর সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টে অগ্নাস্থ পার্টি রাজত্ব করছেন তাদের মতিগতি স্বভাব চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত একজন এই পথে যাচ্ছে অগ্নাজন ঐ পথে যাচ্ছে কিন্তু হু'দলই বলছে পৃথিবীর লোকের জন্ত আমাদের প্রাণ কাঁদছে। কী বলবো! সেই লোকের জন্তে কোথায় যে তাদের কাঁদা! সেটা আপনাদের পশ্চিমবঙ্গের সরকার কী আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার গলার আওয়াজ কার বেশী আর বক্তৃতার মধ্যে কার সাহায্য বেশী বলা কঠিন। সুতরাং সে সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করা অনাবশ্যক।

এই দেশে যদি বেঁচে থাকতে হয়, যদি অগ্রসর হতে হয় তা' হলে এই গ্রামগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। গ্রামগুলোকে

পুনরুজ্জীবিত করার অর্থ এই নয় সরকার নিজের টাকা দিয়ে কিংবা
অন্যদেশ থেকে ধার করা টাকায় রাস্তা বানানো, হাসপাতাল
বানানো, লোকের ঘর বানানো এ নয়। পুনরুজ্জীবিত করা মানে
জীবগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। এই দেশের পুরুষ স্ত্রী
ছেলে মেয়ে সবাইকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তাদের মধ্যে প্রাণ
প্রতিষ্ঠা করতে হবে, সঙ্গতির পথ করতে হবে, তাদের শিক্ষা দিতে
হবে, তাদের সব জিনিস শিখাতে হবে। এমন কী নিজের
ভবিষ্যতের জন্তু তাঁদের মধ্যে ইচ্ছা এবং সংকল্প সৃষ্টি করতে হবে।

আমি ৩০ বছর পর এসেছি। রানাঘাট ছাড়ার পর ফুলিয়ার
কাছাকাছি আসতে দেখলাম দু'দিকে কৃষি প্রণালীর বলা যায়
অসাধারণ রকম উন্নতি হয়েছে আগের তুলনায়। একটা ভুল
হয়েছে। এই মিটিং করার আগে আমাকে যদি এই শহরটা
১৫/২০ মিনিট ঘুরে দেখানো হতো তা হলে আমি বুঝতে পার-
তাম কী হচ্ছে না হচ্ছে।

আমাকে ৬ মাস আগে এখান থেকে এক ভদ্রলোক বলেছিলেন
পলিটেকনিক বন্ধ হয়ে গেছে। আপনাদের থেকে যদি অভিযোগ
থাকে আমাদের এখানে ট্রেনিং এর ভাল ব্যবস্থা নেই কিংবা যারা
teachers তাঁরা খুব দক্ষ লোক নন, শিখাতে পারছেন না
তাহলে তা' আমি বলতে পারি কিন্তু ট্রেনিং সেক্টরকে Poly-
technic বলা হয় I. T. I. বলা হয় না সে জন্তু তারা Strike
করেছে এবং ৩ বছর বন্ধ আছে। বুঝিনা! এর অর্থ আমার বুদ্ধি,
আমার জ্ঞান আমার মনের মধ্যে এর কোন develope হয়না।

এখানে বাইরে থেকে যা দেখলাম, বাড়ীগুলোর দিকে যেন
কারো দৃষ্টি নেই, নোংরা। বাড়ীগুলো যেন নিজেদের মনে
হয়না। সরকার হয়তো কাগজে কলমে বাড়ীগুলো আপনাদের
দেন নাই যদি না দিয়ে থাকে তাহলে কাগজে প্রমাণ দরকার।
এই নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার। আপনাদের সরকার
আমায় এনেছেন বললাম আমি ওকালতী করতে রাজী আছি
কিন্তু বিষয় জানা দরকার। আপনাদেরকে বলতে হবে এই
জিনিসগুলো করা দরকার, বলতে হবে আপনাদের তরফ থেকে।
বলতে হবে এইগুলো যদি করা হয় তবে সাংঘাতিক ভাবে

জীবিকা অর্জন করতে পারি এই শহরে।

আপনারা যারা যিনি B. D. O. আছেন Adviser আছেন, পঞ্চায়েতের President আছেন তাঁদের কর্তব্য এগুলো অভিযোগ করা প্রয়োজন হলে আপনারা আন্দোলন করতে পারেন। সমস্যাটাকে উন্নত করার জন্য যে চেষ্টা এবং সেই চেষ্টার জন্য যদি আন্দোলন করতে হয় তা করবেন।

আমি জানিনি আমাকে জানতে দেওয়া হয়নি কী ব্যাপারটা কী? রোগটা কী? ঔষধটা কী করে বাংলাতে পারি বলুন। গোলমালটা কী? আপনাদের এই শহরের জমি, বাড়ী, রাস্তা দোকান পায়খানা কী গোলমালটা কোথায়! এই মেয়েদের দেখে আমার ভাল লাগছে। এদের মধ্যে একটা প্রাণ আছে, মেয়েদের মধ্যে অসাধারণ শক্তি সেই কারণেই পৃথিবীটা বেঁচে আছে। কী চাই জানিনি! সে সম্পর্কে আপনাদের একটু চিন্তা করা দরকার। ব্লক পঞ্চায়েত সমিতির মিটিং-এর আগে বা পরে আপনাদের সঙ্গে বসতে রাজী আছি যতক্ষণ চান। আমি যখন ফিরে যাব আপনাদের সরকারের কাছে তখন এর কথা লিখে ওদের কাছে দিয়ে রাখতে পারি। গভর্নরকে ডাকতে বলে ছিলাম। গভর্নরের এইখানে আসার একটা অর্থ আছে, ব্যক্তিগত হিসাবে আমার এইখানে আসার কোন অর্থ নেই।

আমি আপনাদের কী করতে পারি? শুধু ওকালতী করতে পারি। Fees কিছু লাগবে না শুধু সময় একটু লাগবে, চিন্তা করতে হবে কী বিষয় নিয়ে আমি ওকালতী করবো।

আপনাদের এই ফুলিয়া শহরের পত্তনটা, বুনিয়াদটা অনেক দূত করে লাগানো হয়েছিল তার পেছনে যা কল্লনা ছিল তার মধ্যে ক্রটি কিছুই ছিল না এবং যথেষ্ট টাকা পয়সা খরচ করা হয়েছে। যথেষ্ট বুদ্ধিমান লোক দক্ষ লোক এই কাজে আপনাদের সহায়তা করেছেন, এঁদের দিয়ে সফল যদি তেমন না হয় সেইটা ওঁদের দোষ নয়, সেইটা সবচেয়ে বেশী দোষ এই শহরে যারা বাস করছেন আজ তাদের সম্মিলিত বুদ্ধি এবং শক্তির অভাব। সম্মিলিত বুদ্ধি এবং শক্তি যদি একত্রিত হয়ে আপনারা চেষ্টা করেন তাহলে আপনাদের সেইকাজ সফলতা দেবে এই সম্পর্কে নিঃসন্দেহ।

[পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি হয়ে শ্রীযুক্ত এস. কে. দে ফুলিয়ায় এসেছিলেন গত ১৬/১১/৮২। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন প্রাক্ষণে ফুলিয়া বাসীদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের অংশ বিশেষ এখানে ছাপা হলো।]

—সঃ সাঃ সৈঃ

স্বপ্ন এবং সত্য

এস. কে. দে

বেশী কথা নয়, কাজ। —এটি আমাদের লক্ষ্য হওয়া উচিত। তা' না হলে সব কিছু ঘুলিয়ে যাবে।

স্বাধীনতার প্রাক্কালে একটি স্বপ্ন জেগে উঠেছিল। সেই স্বপ্ন মুখ্য একটি মানুষ সাধ্যমত কিছু গড়ার জন্তে এগিয়ে এসেছিল। —সেই মানুষটি হচ্ছে আমি। বয়স আমার তখন ৪১।

দু'খ কষ্টের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। উত্তর ভারতকে আমি জানতাম গভীরভাবেই। স্বাধীনতার সময় আমি কুরুক্ষেত্রের রিফিউজি ক্যাম্পের ধারে কাছেই বসবাস করছিলাম। কাজ করতাম আমি এক বহুজাতিক সংস্থায়। —ফলে ভারতবর্ষ তো বটেই বর্মা এবং শ্রীলঙ্কাতেও আমাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছিল। এমনতর অবস্থাতেই তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নেহরুর সঙ্গে আমার সংযোগ ঘটে যায়। তিন তখন নতুন ভারত গড়ার স্বপ্ন দেখছিলেন। হয়তো আমি গ্রামে জন্মেছিলাম বলেই আমিও সেই স্বপ্নের শরিক হয়ে গিয়েছিলাম।

এদিকে এক নতুন সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। সে সংগ্রামের একদিকে ছিল সবহারা কিছু ভবঘুরে, অশুভদিকে ছিল ইংরেজ শাসনের স্তম্ভগুলো—অর্থাৎ আমলা, ইঞ্জিনিয়ার রাজনীতিবিদ, জমিদার, ঠিকাদার এরা। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটা ভাবনা জেগে উঠেছিল যে—যদি রিফিউজিদের নিয়ে নতুন নগরী আর উপনগরী গড়ে তোলা যায় তো এদের জীবন ও জীবিকার অনেক সমস্যা সুরাহা হয়ে যাবে। দীর্ঘদিনের পরাধীন ভারতবর্ষে এ কাজ গড়ে তোলা খুব সহজ সাধ্য ছিলনা—নেহরু এ কথা বুঝতেন।

নতুন শহর গড়ার কাজে নেহরুজী আমাকে বৃত্তিগত এবং কারিগরী শিক্ষা প্রবর্তনে উৎসাহিত করলেন। বাড়ী তৈরীর

শাজ সন্ন্যাস ব্রহ্মসাম্প্রদায়িক ইত্যাদি শব্দেই বাঙালি প্রাণীভাবের স্থানীয়ভাবে তৈরী করে নিতে হবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ—অন্যদিকে ক্ষুদ্র কুটীর শিল্প তার মাঝে সমবায় এই গুলো সব মিলে মিশে মিশ্র অর্থনীতি গড়ে উঠবে এটাই ছিল সবার ধারণা। —কিন্তু কান্সার্মী স্বার্থের একদল মানুষ, তারা উত্তর ভারতের শহর-গুলোকেই ফাঁপিয়ে তোলার ফন্দি আটছিল। এদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুরা হুড়হুড় করে দিল্লীতে ঢুকে পড়লো। তারা অবশ্য কিছু পেলো আর পূর্ব পাকিস্তান থেকে যারা এলো তাদের কপালে? তারা কেবল আবার জন্মভূমিতে ফিরে যাবার অলীক স্বপ্নই দেখলো। এই পরিস্থিতি-তেই নতুন প্রকল্পের জন্ম হলো।

একটি উপনগরী গড়ে তোলার ভার আমাদের দেয়া হলো যেখানে শিকা এবং জীবিকার সমন্বয় ঘটবে এই হিসেবে উত্তর ভারতে নিলোখেরির জলা ভূমিতে একটি কেন্দ্র গড়ে উঠলো। তার কিছুদিন পরে পশ্চিম বাঙলার ফুলিয়াতেও আর একটি কেন্দ্র জন্ম নিলো।

তিন দশকেরও বেশী সময় ইতিমধ্যে অতিক্রান্ত।

নিলোখেরি প্রকৃতপক্ষে ৫ হাজার লোকের আবাসস্থল এবং প্রায় ২৫ হাজার গ্রামবাসীর বিকল্প কর্মক্ষেত্র হিসেবে স্থাপিত হয়েছিল। বর্তমানে ওখানে ১৫ হাজার লোক বসবাস করেন এবং একলক্ষ লোকের কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট ব্রক এর প্রধান কার্যস্থল।

উত্তর ভারতের তুলনায় নিলোখেরিতে উৎপাদনের গড়-পড়তা অনেক বেশী। ফলে, যে সমস্ত বাড়ী একসময় বিক্রি করা হয়েছিল ৬ হাজার টাকায় এখন তার দাম ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা। এক একর জমি সে সময় বিক্রি করা হয়েছিল ৬০০ টাকায় এখন তার দাম ৮০ হাজার টাকা। এই উপনিবেশে হিন্দু, সনাতন, আর্য সমাজী, শিখ এরা সবাই অবস্থান করেন। — কোন বিবাদ বিসম্বাদ এদের মধ্যে নেই।

১৯৫০ সালে ফুলিয়াতে উদ্বাস্তুদের নিয়ে একটি উপনগরী সাহিত্য সৈকত, জুলাই-সেপ্টেম্বর

স্থাপিত হয়। উচ্চ বর্ণ এবং নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা এখানে এসে
ভিড় করে। শ্রমের এক মহাযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় এখানে।

এদের জিগির ছিল—বাঁচার অধিকার দিতে হবে—শ্রমের
অধিকার দিতে হবে এবং সেই শ্রমের ফল ভোগ করার
অধিকারও দিতে হবে। পঞ্চায়েতগুলো এই সব মানুষের
কাজকর্মের দেখাশোনা করতো এবং দীর্ঘ দিন ধরে যে সব অনা-
বাদী জমি পড়ে ছিল সেগুলো ফসল ফলাতে শুরু করলো—যেন
একটা নবজাগরণ শুরু হয়ে গেলো।

কিন্তু নেহেরুর পর কেন্দ্রীয় সরকার ফুলিয়াকে যেন ভুলেই
গেলেন।

কেন্দ্রীয় পূর্ণবাসন মন্ত্রণালয়ে ফুলিয়ার কোন কাগজপত্রই
নেই। ভাবতে অবাক লাগে যে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার
যারা কিনা গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্তে সচেষ্ট তারাও
ফুলিয়ার জন্তে কিছুই সাহায্য করতে পারছেন না। এই উপ-
নগরীর সমস্ত সম্পদ যেমন—কারিগরী বৃত্তি শিক্ষা বিদ্যালয়,
হাসপাতাল, ট্রেনিং সেন্টার এসব থাকা সত্ত্বেও জনগণের কোন
কাজেই লাগছে না। এই শহর কেন্দ্রীয় সরকারের একটি অনাথ
বালক—যাকে সে ভুলে গেছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আমন্ত্রণে ১৯৮২ সালের শেষ দিকে
বর্তমান লেখক ফুলিয়া পরিদর্শনে গিয়েছিলেন এবং নিজের
চোখে দেখে এলেন সরকারের অপদার্থতা। তিনি ব্যক্তিগত
ভাবে কিছু সাধারণ সমস্যা এবং সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে
কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের কাছে বলেছেন।

নিলোখেরি সফল হলো কিন্তু ফুলিয়া খুঁকে মরছে কেন ?

এই প্রশ্নটি পাওয়া যায় কিন্তু এর উত্তর খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছেনা। বাঁচার অধিকারকে পাওয়ার জন্তে জনগণকে একত্রিত
হতে হবে। কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোকে তাদের জনগণের
উন্নতি—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতার
জন্তে একত্রিত হতে হবে। নিলোখেরি এবং ফুলিয়া উভয়েই
আমাদের দেখিয়েছে যে উন্নতির জন্তে এ ধরনের কেন্দ্রের প্রয়ো-
জন আছে। সোভিয়েত রাশিয়া, চীন এবং অন্যত্র গ্রামের
সাহিত্য সৈকত, জুলাই-সেপ্টেম্বর

সাম্প্রদায়িক মীথসেব স্বাস্থ্য এবং আর্থিক উন্নতি তাদের এই উন্নত পর্যায়ে এনে দিয়েছে।

গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা দেশের সার্বিক উন্নয়নে একটি প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে পবিলক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু নেহেরুর মৃত্যুর পর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং বিধিগত দিক থেকে এ দিকে আবার নজর দেয়া হয়নি—এর জন্যে আমি নেহেরুর উত্তরাধিকারীদের দোষ দিতে চাইনা কেননা, জনগণের শক্তি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত পার্লামেন্ট এবং রাজ্য বিধান সভার সদস্যগণ আশ্চর্যজনকভাবে কলের পুতুল বনে গেছেন।

ভাবতবর্ষে কোন দিনই সেনা শাসিত শাসন ব্যবস্থা আসতে পারেনা কেননা এর বিবাত ভৌগলিক অবস্থা বহু ভাষা এবং বহুতর ব্যাপ্তি এর সংস্কৃতি। পৃথিবীতে এমন কোন আর শক্তি নেই যে কিনা ভাবতবর্ষকে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার করতে পাবে। তবুও বলবো শাস্ত্রবর্ণিত কলিযুগ থেকেও ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক, সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ—এর কারণ কেন্দ্র এবং রাজ্য স্তরে কিছু স্বার্থম্বেষী ব্যক্তির ক্ষমতা অধিগ্রহণের ব্যাপাবে উদ্‌গ্রীব।

উগ্রপন্থা ভারতের নানান রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। —এর কারণ হলো বেকারী আর যথোপযুক্ত জীবিকার সংস্থান না থাকা। তারই ফলে সাম্প্রদায়িকতার এত বিষ চারদিকে ছড়াচ্ছে। জনমানসে বিভেদ বৃদ্ধি সঞ্চারিত হচ্ছে। কিন্তু এই হিংস্রতা আর উগ্রপন্থা এই দেশটাকে কী উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে? এ বিষয়ে ভাবনা চিন্তা করার সময় এসেছে আজ।

গণতন্ত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব অনিবার্য। নেহেরুজী বিরোধীদের সম্মান দান করতেন। কিন্তু আজ সেই বিরোধীদের অস্তিত্বই বিপন্ন।

প্রদত্ত মনে পড়ে যাচ্ছে ইরাকের যাজুঘরে একটি বাণীর কথা। চার হাজার বছর ধরে সেই বাণীটি সকলকে নীরবে শুনিয়ে যাচ্ছে। বাণীটি হচ্ছে এই—নগরে যদি সতর্ক কুকুর না থাকে তো সেখানে শয়ালের রাজত্ব হয়। আমাদের এই উপ-মহাদেশে কী অংশে সেই শয়ালের রাজত্ব শুরু হচ্ছে?

ভোলা অনুচিত

গোপাল চন্দ্র চক্রবর্তী

বছর কয়েক আগের কথা। ফুলিয়া শিক্ষানিকেতন ও সদ্য চালু ফুলিয়া বিদ্যামন্দিরের সমস্তা নিয়ে একদিন খুব ভোরে নদীয়ার ডি, এম, সাহেবের বাংলোয় গিয়েছি। নদীয়ার তখন জেলা শাসক মিঃ এস, ভি, সপ্তর্ষি। অসম্ভব কর্মব্যস্ত ডি, এম। তাঁর কর্মচাঞ্চল্যে জেলার সব সরকারী কর্মচারী একদিকে সাময়িক কর্মপ্রবণ, আর একদিকে গোটা জেলায় তাঁর প্রচণ্ড গতিবিধি।

চেয়ারে ঢুকে নমস্কার জানাতেই আমাকে এক প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, “মিঃ এস, কে, দেব ফুলিয়া সম্পর্কে ধারাবাহিক লেখাগুলি স্টেটসম্যান পত্রিকায় পড়েছেন?” তখনও লেখাগুলি আমার নজরে আসেনি। আবার প্রশ্ন—“কেবল স্কুল নিয়েই থাকবেন? ফুলিয়া টাউনশিপের সমস্তা সমাধানের জন্য কিছু করছেন না কেন? একটা প্রশ্নেরও জবাব দিতে পারিনি সেদিন।

মাসখানেকের মধ্যে ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে নবগঠিত বিদ্যামন্দির দেখতে এলেন। কথাবার্তার পরে আমাকে একান্তে ডেকে বললেন—“ঘাঁর উদ্যোগে ফুলিয়া উপনগরীর পত্তন তিনি এখন বৃদ্ধ। আজও ভাবছেন ফুলিয়ার কথা। ফুলিয়াবাসীর তরফ থেকে তাঁকে এখানে একবার আনা উচিত নয় কি? এ-সব লোককে সম্মান ও শ্রদ্ধা জানালে নিজেদেরই গৌরব বাড়ে।”

তাঁর মস্তব্যে আমি পুরোপুরি সায় দিলাম। তিনি চলে গেলেন।

রানাঘাটের মহকুমা শাসক, শান্তিপুরের বি, ডি, ও, ও ফুলিয়ার কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ডি, এম, সাহেবের কথা জানালাম। এস, ডি, ও, সাহেবের পরামর্শে একটি সম্মেলন

কমিটিও গঠিত হল। কমিটি সক্রিয় হবার আগেই ডি, এম সাহেব অনেক এগিয়ে গেলেন। রাজ্যের চিক-সেক্রেটারীকে ধরে স্থির হয়ে গেল—পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য মি: এস, কে, দেব পরামর্শ চাওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আসবেন তিনি স্টেট-গেট-হিসেবে। কয়েকটি জেলা ঘুরবেন। স্বভাবতই ফুলিয়া আসার দিন স্থির হয়ে গেল।

ডি, এম, সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন—“ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনে মি: এস, কে, দেবকে সম্বর্ধনা দেওয়া হবে। ওখানেই তিনি লাঞ্ছিত করবেন। তারপর টাউনশিপ দেখবেন। আপনাকে কিছুটা দায়িত্ব নিতে হবে; সব ব্যবস্থা অবশ্য সরকার থেকে করা হবে।”

বিস্ময়কর কর্মী মি: এস, কে, দেব হাতে ছিল সেদিন ছড়ি। বয়সের ভারে কিছুটা মূঢ়। ফুলিয়া বালিকা বিদ্যালয়, শিক্ষানিকেতন ও বিদ্যামন্দিরের ছেলেমেয়েরা তাঁকে জ্ঞানী জানাল। তাঁর অতি পরিচিত ফুলিয়ায় এলেন তিনি। পূর্ব পরিচিত সকলকেই তিনি চিনলেন ও কথা বললেন।

লাঞ্ছিতের পর ফুলিয়া উপনগরী ও চাষী কলোনী তাঁকে দেখান হল। তার স্মৃতিতে সব সজীব! ফুলিয়া গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং স্টেট সীডকার্গার তৎকালীন অবস্থা দেখে মন্তব্য করলেন—“এতগুলি ডিগ্রীধারী কৃষি বিশারদ মোটা টাকা দিয়ে পুষে লাভ কি? জমিগুলি দরিদ্র কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া উচিত। ফসল ফলবে, মরুভূমি হয়ে থাকবে না। সেচ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও এত হাল!”

গাড়ীতে আমি পাশে বসি। সবুজ পল্লীর পথ ধরে চাষী কলোনীর দিকে যেতে যেতে প্রশ্ন করলেন—“আচ্ছা বলুন তো কারণ কি? সরকার তো ১৯২০/২২ সালে জমির যে মূল্য ছিল

সেটা চাইছেন। এখন জমির দাম কত বেড়েছে। ফুলিয়াবাসীর অবস্থাও অনেক ভাল হয়েছে। তবু সরকারকে জমির ক্ষয় গুল্য দিতে আপত্তি কেন ?” আমি সঙ্গত জবাব দিতে পারিনি।

কয়েক ঘণ্টা ফুলিয়ায় কাটিয়ে তাঁর হাতে গড়া উপনগরীর সম্প্রসারণ দেখে গেলেন তিনি। স্বজন ধর্মী মানুষের এ-যেন নাড়ীর টান! পৃথিবীতে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ জন্মান—ধারা নীরবে সৃষ্টি করেন। গড়াটাই তাদের ধর্ম। তাঁরা প্রচার চান না, স্বীকৃতি চান না, প্রতিষ্ঠা চান না, গড়ার আনন্দে মেতে থাকতে চান। তাঁরা গড়েন, হাজার হাজার লোক তার ফল ভোগ করে। আচার্য পি, সি, রায়, স্বর্গত বিধান চন্দ্র রায় ও এস, কে, দে সেই জাতের মানুষ।

পাঞ্জাবের নিলাখেড়ী ছিল ধু ধু মাঠ। বম্বার জলের মত ভেসে আসা বিহ্বল মানুষদের আস্তানা গড়লেন নিলাখেড়ীতে। যুদ্ধকালীন ক্ষততায় গড়ে তুললেন সুন্দর এক উপনগরী। সুপরিকল্পিত গোছান উপনগরী। ঠিক তেমনি পশ্চিমবঙ্গে বুই-চার ধু ধু মাঠ বেছে নিলেন তিনি—উজ্জ্বল ক্যাম্প থেকে জন-স্রোতকে সরিয়ে আনবার উদ্দেশ্যে। দেশ ভাগের ভ্রান্তি বিলাসের ছুদিনের কথা আজও দেহে শিহরণ জাগায়। সেই দিনে সেই ছুর্যোগে এস, কে, দে গড়ে তুললেন ফুলিয়া উপনগরী যেন বিশ্বকর্মার শক্তি নিয়ে। আরকিটেঙ্কি তো আমরা অনেকই দেখি। এ এক অদ্ভুতকর্মী আরকিটেঙ্কি। রাত নেই, দিন নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই; কাজ আর কাজ। এক কথা-ঘর গড়, বাড়ী বানাও; ছিন্নমূল মানুষকে আস্তানা দেও।’

আজ সব স্মৃতি। এই সেই এস, কে, দে। অনন্য কর্মী এস, কে, দে। ইতিহাসে দেখি—কাজই কথা বলে। আমার বিশ্বাস স্বর্গত এস, কে, দের কাজ চিরদিন কথা বলবে। সমষ্টি উন্নয়ন ব্লক সংগঠন ও পঞ্চায়েত রাজ গড়ার পেছনে তার অবদান তুলবার নয়। তাঁকে প্রশংসা জানাই।

ফুলিয়া উপনগরী ও দে সাহেব

গণেশ চন্দ্র রায়

গত ১৪শে মে, ৮৯ সন্ধ্যাকালের আনন্দবাজার পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় গান্ধী টুপি পরিহিত আমাদের অতীত দিনের সহযোগী কর্মবীর এস, কে, দে'র ছবিখানি মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখছিলাম।

মনকে সাস্তুনা দিতে পেরেছি, এবং সাস্তুনা দিয়েছিও এই ভেবে যে সময়ে যা করার বা ভাববার এই কর্মবীর লোকটি যখন সময় দেশের এবং দেশের জন্য বিশেষ করে সাধারণ মানুষের জন্য সারা জীবন তিনি সংগ্রাম করে গেছেন।

আমরা তাঁকে পেয়েছিলাম একজন উদ্বাস্তু দরদী মানুষ হিসাবে। ভারতের স্বাধীনতার পর তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্তুদের নিয়ে যে বিরাট সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল, তিনিই একমাত্র লোক স্বৈচ্ছায় এই সমস্যার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন এবং তাদের বেঁচে থাকার অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য পাঞ্জাবে নীলোখেরী এবং পশ্চিমবঙ্গে ফুলিয়া উপনগরীর পরিকল্পনা করেন তিনি। উদ্বাস্তুদের দুঃখ কষ্ট নানান সমস্যার কথা চিন্তা করে, তারা কি ভাবে এই স্বাধীন দেশে স্বাধীন নাগরিক হিসাবে নিজ পেশাগত কর্ম ও পরিশ্রমের বিনিময়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু করেছিলেন এই দরদী মানুষটি।

যে দরদ ও মমত্ব দিয়ে এই সর্বহারা মানুষগুলির বেঁচে

এরপর ১৮ পৃষ্ঠায়

হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে

ডাঃ হরিশঙ্কর কুণ্ড ডি. এম, এম (ক্যাল) ; পি, ই, টি,
এফ, ডব্লু, টি (ক্যাল)

আমি অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখছি না বা কোন আতস কাঁচও ব্যবহার করছি না ; হোমিওপ্যাথি যা করতে পারে, যা দেখাতে পারে সেটাই এখানে সহজ করে বলার চেষ্টা করছি ।

অহরহ শুনেতে পাঠি যার নেই কোন গতি, সে করে হোমিওপ্যাথি* কথাটা নিছক মিথ্যা নয় । কারণ অনেকেই নিরুপায় হয়েই হোমিওপ্যাথির শরণাপন্ন হন । উপকৃত হলে উৎসাহিত হন, না হলে বিরূপ মন্তব্যো মুখর হন এটা হোমিও-প্যাথির ট্র্যাজেডি ছাড়া আর কিছুই নয় ।

সত্যি কথা বলতে কি, যে রোগ মুক্ত হওয়ার নয়, হোমিও-প্যাথিও সেখানে নিশ্চিতভাবেই অসহায় । যেখানে কোষগুলি পুরোপুরি রূপান্তরিত হয়ে গেছে সেখানে কি করবে এই প্যাথি ?

চিকিৎসা জগতে অনেক পদ্ধতিই বিদ্যমান । যেমন অ্যালো-প্যাথি, হোমিওপ্যাথি, কবিরাজী, হেটারোপ্যাথি, আইসো-প্যাথি, মেসমেরিজম, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি ।

কিন্তু আমাদের অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে প্রত্যেকের কর্ম ক্ষমতা এক নয়-এবং কোন পদ্ধতিই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় । তবে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভের একটা রেঘারেঘি সদাসর্বদা রয়েই গেছে, আর তা আছে বলেই চিকিৎসা জগতেও আছে অনেক জটিলতা ।

হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠা ডঃ হ্যানিমন্যান কখনই অপ্ৰয়োজনীয় কথা বলেননি । পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে উপলব্ধি করতেই উপদেশ দিয়েছেন ।

এখন তা হলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগছে হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে ? এর উত্তরে বাধ্য হয়েই রোগের রহস্য ভাঙারে প্রবেশ করতে হয় ।

যেমন দেখা যাচ্ছে বিচক্ৰণ লোকের নিক্ষিপ্ত কলার খোসায় পিছলে পড়ে গিয়ে জনৈক ভদ্রলোকের মালাইচাকি খুলে গেল এবং ভদ্রলোক সাংঘাতিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন ।

‘ইম্পারপোরেটেড’—এনাস (Imperporated Anus) বা ইম্পারপোরেটেড হাইমেন নিয়ে আজ যে শিশু জন্মালো তার উপায় কি ? কেনই বা এমনটি হল ? স্টীলবোর্ন (Steel Borne) বা ডেড্ বোর্ন (Dead Borne) শিশুই বা কেন হল ? এ সবার গুট রহস্য কোথায় ?

সত্ত্ব জাতকের হৃদপিণ্ড কোরামেনা-ওভেলি বন্ধ না হওয়ার দরুণ শিশু ধারণ করলো নীলবর্ণ । চারিদিকে সমস্বরে অনেকেই বলতে লাগলেন পের্চোয় পেয়েছে । ওঝা ডাকা হল—চলল তত্ত্ব-মত্ত্ব । কিন্তু হায় ! কোথায় এর রহস্য ? এ ছাড়া, পত্র-পত্রিকা-য় সাবধান বাণী থাকে সত্ত্বেও আমরা সূর্যগ্রহণ দেখি মাদকদ্রব্যে আসক্ত হয়ে পড়ি, আমরা প্রায় সকলেই বিভিন্ন রিপূর শিকার হয়ে পড়ছি । কোন নিবেদনই মানছি না আমরা । আর মানবই বা কেন ? আমরাও তো সেই আদম ইভেরই উত্তর-সূরী ।

আবার দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হঠাৎ মানসিক রোগগ্রস্ত হয়ে জীবনে যবনিকা টেনে দিল ।

এই সমস্ত জটিল অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য আমরা আসক্ত হয়ে যাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের ঔষধের প্রতি । ঔষধ যেমন রোগ মুক্ত করতে পারে, আবার ঔষধ রোগ সৃষ্টিও করতে পারে ।

তাই তো ভিটামিন অতিরিক্ত মাত্রায় খেলে যে দূবারোগ্য রোগের সৃষ্টি হয়—তার নাম ভিটামিনোসিস। পুরুষ সম্প্রদায় যদি বেশী মাত্রায়—লৌহষটিত ঔষধ ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত লৌহ মস্তিষ্কে পুঞ্জীভূত হয়ে সৃষ্টি করতে পারে থ্রম্বোসিস। আবার দেখা গেল কলিঙ্গ যুদ্ধের পরে রক্তের বন্ধ্যা পুরোপুরি পালটে দিল অশোককে। অশোক সম্রাট হ'লেন এবং দীক্ষিত হলেন বৌদ্ধধর্মে।

ধর্ম প্রচারে পাঠালেন মহেন্দ্র এবং কন্যা সংঘমিত্রাকে। পক্ষান্তরে একজন দীর্ঘদেহী, সাহসী, বলিষ্ঠ যুবক জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন কিছুটা রক্তপাত দেখে। উভয়ের ক্যারাক অনেক। কেন এত ফারাক ?

এখন প্রশ্ন হচ্ছে হোমিওপ্যাথি কি করতে পারে ? কতটা পারে ?

সহজ করে অতি সংক্ষেপে একটা কথাই বলতে হয়—হোমিওপ্যাথি ভাবে কেন এমন হল ? হোমিওপ্যাথি তার উত্তর খুঁজে বের করে আর সেটাই মুক্ত করা হোমিওপ্যাথির একমাত্র কাজ। ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস সদা-সর্বদাই চারদিকে ঘোরাফেরা করছে। আমাদের দেহের গহ্বরে অহরহ প্রবেশও করছে। কিন্তু আমরা কি সকলেই অসুস্থ হয়ে পড়ছি ? উপযুক্ত পরিবেশ যাকে বলা হয় 'Suceptibility' ছাড়া রোগ জীবাণুর রোগ সৃষ্টি করার কোন ক্ষমতাই নেই। আর এই পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে কে ? সোরিয়ক, সিফিলিটিক এবং সাইকোটিক আর হোমিওপ্যাথির একমাত্র লক্ষ্য ঐ মায়াজম্, দূরীকরণ এবং সুস্থ দেহ-মন গঠন।

(ক্রমশঃ)

(১৪ পৃষ্ঠার পর)

থাকার, খেঁটে খাবার অধিকারকে বিভিন্ন ভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি তা একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানন্দ্র রায় ছাড়া আর কেউ চিন্তা করেছিলেন বলে আমার জানা নেই।

দেশ বিভাগের অদূর দর্শিতার জন্য সারা ভারতবর্ষে যে উদ্বাস্তু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল, তা সমাধান কল্পে তৎকালীন ভারতের প্রধান মন্ত্রী জহরলাল নেহেরু সারা ভারতবর্ষে (বিভিন্ন প্রদেশে) উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেবার চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্বাস্তু সমস্যা দ্রুতগতিতে সমাধানের জন্য তিনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সভায়, প্রগতিশীল, দেশ দ্রুদী নিষ্ঠাবান সমাজ কর্মীদের স্বেচ্ছায় দায়িত্বভার গ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন।

যিনি সর্বপ্রথম প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সারা দিয়ে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তিনি হলেন প্রখ্যাত ইনজিনিয়ার এস, কে, দে। স্বেচ্ছায় দায়িত্বভার গ্রহণ করে পাঞ্জাবের এক অধ্যাত জনমানবহীন স্থান নীলোখেড়িতে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন দে সাহেব। খুব সম্ভব ১৯৪৯ সালে।

তার পরিকল্পিত পরিকল্পনা পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের বেঁচে থাকা খেঁটে খাওয়ার পথ তৈরী করে দিয়েছিল। পাঞ্জাবী উদ্বাস্তু ভাইরা সেই সুযোগ নিয়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের মধ্যকার দলাদলি ও রাজনৈতিক প্রভাব থেকে নিজেদের মুক্ত রেখে পেশাগত কাজে যুক্ত করেছিল এবং সমবেত পরিশ্রমের দ্বারা সমবায়ের মাধ্যমে ছোট ছোট শিল্প, কলকারখানা, কৃষি-

খামার ইত্যাদি গড়ে তুলেছিল।

নেহরুজী নীলোশেড়ীতে দে সাহেব কাজকর্ম দেখে খুশী হয়ে-
ছিলেন এবং পশ্চিমবাংলাতেও অন্তরূপ কিছু করা যায় কিনা
ভেবে দেখতে বলেন।

দে সাহেব একদিন ছুটে এলেন পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে দেখা
করলেন বাংলার রূপকার মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের সঙ্গে।
আলাপ আলোচনায় সিদ্ধান্ত হলো নীলোশেড়ির ধাঁচে পশ্চিম-
বঙ্গেও উদ্বাস্ত কলোনী গড়ে তোলা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দে সাহেবকে কাজ শুরু করার
সরকারী নির্দেশ দেন, এবং কলোনী গড়ার জন্য তার ব্যক্তিগত
সাহায্য সহযোগিতা এবং সরকারের সর্বপ্রকার সাহায্যের
আশ্বাস দেন।

জ্ঞান নির্দ্ধারণের জন্য সারা পশ্চিমবঙ্গ ঘুরে ১৯৫০ সালের
এপ্রিল মাসের শেষে অথবা মে মাসের প্রথম দিকে জনমানব-
হীন পথ ঘাট বিহীন জঙ্গলে পরিপূর্ণ কবি কুন্তিবাসের ফুলিয়াকে
বেছে নেন দে সাহেব নতুন শহর গড়ার জন্য।

ফুলিয়ায় পৌঁছে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর দাঁড়িয়ে
ফুলিয়াকে দেখছিলেন তিনি এবং কোন্ লোকজনের সাক্ষাৎ
পাওয়া যায় কিনা খুঁজছিলেন। অপ্রত্যাশিতভাবে এক প্রবীণ
লোকের সাক্ষাৎ পেলেন। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জ্ঞানতে
পারলেন এখানে লোকজনের বড় অভাব। কাজের লোক
পাওয়াও বড় কঠিন। তবে বেশ কিছুদিন হলো পুরনো বঁইচা
গ্রামে পূর্ববঙ্গের কিছু উদ্বাস্ত লোক এসেছে, তারা বাড়ী ঘর
করে এখানে আছে। দুই বাবু খামার বাড়ী করেছেন। নাম
কুলদাবাবু ও মণিবাবু। বড়বাবু খুব তেজী লোক। তাদের

লোকজন দিখে এখানে বসতি স্থাপন করছেন দে সাহেব সমস্ত
 স্ত্রী কুলদাবাবু ও মণিবাবুর খামার বাড়ী যা-র রাস্তা জিক্সেস
 করলেন। হেঁটে বহু কষ্টে বেলা ২টা ৩টার সময় কাদা জামা
 জুতো নিয়ে কুলদাবাবু ও মণিবাবুর বাড়ীতে সহকর্মীদের নিয়ে
 উঠলেন। আগন্তুকদের দেখে দুই ভাই ছুটে এলেন। পরস্পর
 পরিচয় বিনিময় হলো। যথারিতি আদর আপ্যায়নও হলো।
 সবাই আলাপ আলোচনায় বসলেন; দীর্ঘ সময় আলোচনা
 হলো, কথা হলো ভারত গভর্ণমেন্ট পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য
 এখানে একটি উদ্বাস্তু কলোনী গড়বেন। আপনাদের সাহায্য
 সহযোগিতা বিশেষ প্রয়োজন। দুই ভাই শহর করার জন্য সর্ব-
 প্রকার সাহায্য সহযোগিতা করতে রাজী হলেন। দে সাহেব
 কলিকাতায় ফিরে এলেন। আমরা যতটুকু জেনেছি, শুনেছি ও
 দেখেছি এঁরা দুই ভাই কলোনী গড়া পর্যন্ত সর্বপ্রকার সাহায্য ও
 সহযোগিতা করেছেন।

কলিকাতায় ফিরে-সমস্ত বিধান চন্দ্র রায়কে অবহিত করেন,
 এবং ফুলিয়া কলোনী করা স্থির হয়।

কয়েকদিনের মধ্যে ফুলিয়ায় কলোনী করার যাবতীয় সরকারী
 আদেশ, নির্দেশ বিজ্ঞপ্তি জারী হয়। দে সাহেব সরকারী নির্দেশ
 সহ কলিকাতা হয়ে ফুলিয়ায় চলে আসেন। সঙ্গে নিয়ে আসেন
 ইন্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার, জমি জরিপ করার আমিন ও
 পিওন। এদের থাকা খাওয়ার স্থান কুলদা মজুমদারের খামার
 বাড়ীতে ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুঠু পরিচালনার জন্তু রিহে-
 বালটেশন্ কলোনী ফুলিয়া নামে কলিকাতায় অফিস করা
 হয়েছিল। কলোনীর যাবতীয় কাজ শুরু হয় কলিকাতার অফিস

থেকে। প্রথমেই সরকারী অফিসার ও কর্মচারী নিয়োগ করা শুরু হল। প্রথমেই নিযুক্ত হলেন এ্যাডমিনিস্ট্রেটর (পি. গুহঠাকুরতা), ইন্‌জিনিয়ার (ডি. বি. দেশাই) ওয়েলফেয়ার অফিসার (শ্রীচরুচন্দ্র জোয়ারদার), পি. এ, ড্রাইভার, চৌকিদার ইত্যাদি।

সবাই একত্রে বসে ফুলিয়ায় একটি নির্দিষ্ট দিনে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। খুব সম্ভব শুভ উদ্বোধনের দিন ছিল ১৫ই জুন ১৯৫০। উদ্বোধনের সময় সর্বশ্রী এস, কে, দে, পি. গুহঠাকুরতা, চরুচন্দ্র জোয়ারদার, ৩টিপু মজুমদার, শ্রুতুমার গুহ, বিধু সরকার ও অজিত ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দে সাহেব শুধু কর্মবীর ছিলেন না। তার চিন্তা ভাবনা ও দূরদর্শিতার কথা ভাবলে অবাক হতে হয়। আমরা নিজেরা দেখেছি ফুলিয়া গড়ার কাজে যে সব অফিসার কর্মচারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন তাদের কর্মক্ষমতা, কর্মচেষ্টা এবং সততা ও নিষ্ঠার কথা আজকের দিনে ভাবা যায় না। এই শহর গড়ার কাজে সর্বমোট বোধ হয় ১৫০ জন ছোট বড় সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন।

উদ্বোধনের বেশ কয়েক দিন পর দে সাহেব ফুলিয়ায় এসে সমস্ত অফিসার ও কর্মচারীদের নিয়ে সভা করেন। সভায় উদ্বাস্তদের জন্ত শহর গড়ার উদ্দেশ্য ও সার্থকতা স্পষ্টে ব্যাখ্যা করেন।

পরের দিন থেকে অফিসার ও স্টাফদের থাকার এবং কাজ করার জন্য সারা মাঠ জুড়ে তাবু খাটানো হল। বেশ কিছু দিন, তাবুর মধ্যে থেকে কাজ করা হল। পরবর্তী সময়ে অস্থায়ীভাবে কিছু স্থান ছনের ঘর করা হল। বিটোমিনাসড্‌সিটের অফিস

ঘর করা হল। অফিসার ও স্টাফের জন্য ক্যান্টিন করা হল। ক্যাম্প থেকে পেশাভিত্তিক উদ্বাস্তু আনা হল। অস্থায়ী একটি বাজার করা হল। উদ্বাস্তুদের তাবু ও চালাঘরে থাকার ব্যবস্থা করা হল। পেশাভিত্তিক ব্যবসায়ীদের অস্থায়ী বাজারে ব্যবসা করার সুযোগ দেওয়া হল। অগ্নদের পেশাভিত্তিক বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হল। এদের দিয়েই শহরের কাজ করার পরিকল্পনা ছিল এবং সেই ভাবেই কাজ করাও হয়েছিল। সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে একটি ফাঁকা মাঠ এক গ্রামের রূপ নিল।

এরপর পরিকল্পনা অনুযায়ী শহরে স্থায়ী বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট, আলো, জলের ব্যবস্থার কাজ শুরু হল। এই কাজ উদ্বাস্তু, অফিসার, স্টাফদের ঐকান্তিক কর্মপ্রেরণা ও নিরলস কর্মপ্রচেষ্টায় দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছিল। সেই সঙ্গে ক্যাম্প হতে আগত উদ্বাস্তুদের সমবায় ভিত্তিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ১৯/২ বছরের মধ্যে ছোট বড় স্বয়ং সম্পূর্ণ শহরের রূপ নিয়েছিল।

পাঞ্জাবের নীলোথেড়ী আজ একটি জেলা শহর রূপে পরিচিতি লাভ করেছে। কিন্তু আমাদের ফুলিয়া অর্ধসমাপ্ত অবস্থায় কলোনী রূপেই পড়ে রহল।

ফুলিয়া শহরের ছরবস্তার জন্য কে দায়ী? সরকার, দে সাহেব না ফুলিয়া শহরবাসী?

**কুস্তিবাস ভিটে
ফুলিয়ার ইতিহাস
প্রকাশিত হয়েছে**

যোগাযোগ :- সার্কুলেশন ম্যানেজার, সাহিত্য সৈকত

সাহিত্য সৈকত

(২২)

এস, কে, দে'র চিঠি

মাধব ভট্টাচার্য

এস. কে. দে'র সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় চিঠিতে, পরে ১৯৮২ সালের নভেম্বর মাসে সাক্ষাতিক পরিচয় ঘটেছিল একবার সেও সামান্য সময়ের জন্যে। তবে সেই সামান্য সময়ের পরিচয়ের স্মৃতিই অসামান্য। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৯ এর মে (তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত) এই সময় সীমার মধ্যে উভয়ের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আর এর বড় মিডিয়া ছিল পত্র লেখা।

পরস্পরেব মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের একটা বড় মাধ্যম হলো চিঠি। চিঠির ভেতর দিয়ে মানুষের জীবনের সত্য যত গভীর-ভাবে প্রতিফলিত হয় আর অল্প কোন মাধ্যমে ততটা হয় না। কোন একজন মানুষের ব্যক্তিগত চিঠি তাঁর জীবন দর্শনেরই প্রতিবিম্ব। চিঠি পরস্পরকে কাছে এনে দেয়, প্রিয়তার স্পর্শ অনুভূত হয় চিঠিতে।

এস, কে, দে'র সঙ্গে পত্রালাপের মধ্যে দিয়ে সেরকমই একটা নৈকট্য গড়ে উঠেছিল আমার।

স্বনাম ধন্য এই এস, কে, দে'র সমসাময়িক আরও একজন এস, কে, দে ছিলেন। তিনি ছিলেন আই, সি, এস অফিসার। সুরেন কুমার দে. আই, সি, এস ছিলেন না, তিনি ছিলেন পেশায় ইঞ্জিনিয়ার পরে ভারতের প্রথম মন্ত্রী সভার সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী হয়েছিলেন। যতদিন মন্ত্রী ছিলেন মাস গেলে এক টাকার বেশি ভাতা নেননি কোনদিন। যাঁর হাতে পাঞ্জাবের নিলো-

খেড়ী উদ্বাস্ত উপনগরী তৈরী সেই এস, কে, দে'র হাতেই গড়া
ফুলিয়া উদ্বাস্ত উপনগরটি।

আমি ফুলিয়া উপনগরীর বাসিন্দা নই। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে
থাকি। কিন্তু উপনগরীবাসীদের সঙ্গে আমার একটা নিকট সম্পর্ক
রয়েছে। ফুলিয়া উপনগরীর কিছু সমস্যা'র কথা আমি জানতাম।
তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল বাড়ি জমির দলিলের
সমস্যা। ১৯১২ সালে নির্মিত বাড়ীতে বসবাসকারী বাসিন্দারা
জমি বাড়ির ডিড পাননি, শহরের উন্নতির কিছু অগ্রগতি হচ্ছে
না। মানুষগুলোর মনে হতাশা নেমে এসেছে। কেন্দ্র ও রাজ্য
সরকারের টানা পোড়নের ফলে উপনগরীটি অনেকটাই অভি-
ভাবকহীন অবস্থায় পড়ে আছে। হতশ্রী এর চেহারা।

এস, কে, দে'র কথা জানলেও তাঁর ঠিকানা খুঁজে পাইনি।
ফুলিয়া উপনগরীবাসীরা কেউ তাঁর ঠিকানা জানেন না। খুঁজে
খুঁজে এক গৃহ পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ও আলাপ হল
একদিন। প্রবাসী বৃদ্ধ গৃহ ভ্রমলোকটি এস, কে, দে'র গাড়ীর
ড্রাইভার ছিলেন। তিনিই আমাকে দিল্লীবাসী এস, কে, দে'র
ঠিকানা দিলেন। এই গৃহ ভ্রমলোকের (নামটি আমি ঠিক
মনে করতে পারছিলাম) কাছ থেকে ঠিকানা পেয়ে দিল্লীতে
এস, কে, দে'কে একটি চিঠি লিখি আমি ১৯৮২ র শুরুতে।
এই-ই প্রথম চিঠি। তার ক'দিন আগে সত্যযুগ (একটি দৈনিক)
পত্রকায় ফুলিয়া সম্পর্কে আমি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম।
চিঠিতে আমি এস, কে, দে কে ফুলিয়ার বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে
জানিয়েছিলাম এবং অনুরোধ করেছিলাম তিনি যদি তাঁর গড়া

এই উপনগরটি সম্পর্কে একটু ভাবেন এবং নজর দেন তাহলে এর উন্নতি সম্ভব।

এস, কে, দে চিঠি পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই আমাকে জবাব দেন। দীর্ঘ চিঠি। প্রতিটি শব্দ যেন অমুভূতির আদলে গাঁথা। সুখে দুঃখে ভরা। তিনি লিখলেন—তিরিশ বছর বাদে আপনি একজন মানুষ যিনি কীনা ফুলিয়া থেকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। অনেকটা অভিমানের সুর। আরও কত কথা। চিঠি পড়তে পড়তে আমার মনে হয়েছিল এই বৃদ্ধ মানুষটিকে আমি বুঝি তাঁর অতীতের স্মৃতি তুলে ধরে চঞ্চল করে তুললাম। তারপর থেকে অনেক চিঠিরই দেয়া-নেওয়া হয়েছে পরস্পরের মধ্যে। আমিই তাঁকে উৎসাহিত করেছিলাম ফুলিয়া সম্পর্কে কিছু লেখার জন্তে। লিখেওছিলেন। তাঁর লেখা যেদিন Statesman কাগজে প্রকাশ পেলো, যতদূর মনে পড়ছে তদানী-স্তন নদীয়ার ডি, এম, এল, ভি, সপ্তম্বি পরদিনই ফুলিয়া ছুটে এসেছিলেন। এরপর একাধিকবারই ত্রীসপ্তম্বি ফুলিয়ায় এসেছেন। বৈঠক করেছেন, এস, কে, দে কে রাজ্য সরকারের আতিথি করে ফুলিয়ায় আনার ব্যবস্থা করেছেন এ সব ফুলিয়া-বাসীদের অনেকেই জানা। এস, কে, দে এবং ফুলিয়াকে ঘিরে এর আগেও আমি অনেকবারই ‘সাহিত্য সৈকত’ এর পাতায় এবং ‘আজকাল’ পত্রিকায় লিখেছি।

এস, কে, দে'র সঙ্গে ১৯৮২ সালে সাম্প্রতিক পরিচয় হওয়ার পর তিনি আমাকে তাঁর দিল্লীর বাড়িতে নেমতন্ন জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমার আর যাওয়ার সুযোগ হয়নি। তাই যা কিছু কথা বার্তা তা চিঠির মাধ্যমেই হয়েছে। তাঁর সঙ্গে আমার পত্রালাপ শুধু ব্যক্তিগত শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ধাকেনি চিঠিগুলোর মধ্যে তঁার ফুলিয়ার প্রতি ভালবাসা, মমত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে। শুধু ফুলিয়া নয় গোটা দেশের মানুষের জন্তে তঁার যে কল্যাণ চিন্তা, রাজনৈতিক ভাবনা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। তাই আমার মনে হয়েছে এ চিঠি শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, ফুলিয়ার মানুষদের জন্যে তিনি যে কল্যাণ চিন্তা আমৃত্যু করে গেছেন তা প্রকাশ পাওয়া উচিত তা ফুলিয়াবাসীদের জানা উচিত। সে কারণেই তঁার চিঠুলো ‘সাহিত্য সৈকত’ এর পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম।

দুঃখের বিষয় আমারই অসাবধানতা বশতঃ তঁার লেখা প্রথম চিঠি সহ শেষ দিকের কয়েকটি চিঠি হারিয়ে গেছে। হারিয়ে গেছে একথা বলাও ঠিক হবেনা। এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। হয়তো কোন সময় পেয়ে যাব। যে ক’টা চিঠি আমার কাছে আছে তাই সবিনয়ে তুলে দিলাম পাঠকদের কাছে। মানুষ এস, কে, দে কে বোঝার পক্ষে, আমার মনে হয় এই চিঠিগুলো সহায়ক হবে।

ফুলিয়া উপনগরীবাসী আজও তঁাদের জমি বাড়ির স্বত্ব পাননি সরকারের কাছ থেকে। হয়ত শীগগিরই পেয়ে যাবেন। কিন্তু এই পাওয়ার পেছনে এস, কে, দে যে প্রচেষ্টা যে ঐকান্তিক চেষ্টা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে রাজ্য সরকারের হাতে উপনগরীটি সম্পূর্ণ হস্তান্তর করে যাওয়ার পেছনে তঁার যে ভূমিকা তা বোধ করি আমাদের সকলেরই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করা উচিত, তা হলেই তঁার প্রতি যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করা হবে।

(১)

নিউ দিল্লী

১৫ এপ্রিল, ৮২

ভট্টাচার্য্য মহাশয়,

আপনার ৯ই মে'র চিঠি। আমি নানা ব্যাপারে বড়ই ব্যস্ত
আছি তা ছাড়া বাংলাতে লেখা একটু অনভ্যস্ত ব্যাপার হয়ে
দাঁড়িয়েছে পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলার বাইরে থাকার দরুন। তবু
চেষ্টা করতে পারি সংক্ষেপ ভাবে।

আপনি অনুগ্রহ করে “সত্যযুগ” কাগজে ছাপানো আপনার
“ফুলিয়া টাউন শিপের হাল অবস্থা” সম্পর্কিত article টা যদি
পাঠাতে পারেন তবে আমার পক্ষে লেখা সহজ এবং সমীচীন
হবে।

অনুগ্রহ করে জবাব দিবেন। ফুলিয়া সম্পর্কে আপনার
প্রচেষ্টার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

লোকগুলো সাধারণ ভালো মানুষ ছিলো। কত আশা করে
বসেছিলো। রাজনীতি দেশটাকে আজ হারবার করে দিচ্ছে।
একে এড়িয়ে চলা অসম্ভব এবং অসাধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীমাধব ভট্টাচার্য্য
সৈকত সরনী, ফুলিয়া

আপনাদের
শ্রুতেন দে

(২)

‘Bul Bul’

5, Laj pat Rai Marg

New Delhi-110024

June 12, 82

Dear Mr. Bhattacharya,

Thank you for your letter and the copy of

সাহিত্য সৈকত

(২৭)

your article which has been of help to me. I have just finished in long hand, and in English unfortunately, an article around 2000 words titled "Phulia, was it a dream.?"

In view of the wider concern that has emerged, I have decided to send the article for a national Newspaper which should be of help to Phulia as well as to W, Bengal in general

I would have the article typed out by my grand daughter, and a copy posted to you in 3-4 days. You may have it translated literally by yourself in Bengalee and have it published in your paper. In a fortnight or so I would know which national paper will publish it so that you can acknowledge it as a courtesy to it even though your publication of the article will be in Bnngalee.

My article will tell you more as my feelings over phulia what I can say in this brief letter.

Sincerely Yours

S. K. Dey

(৩.)

June 16, 82

New Delhi

Dear Mr. Bhattacharya,

Enclosed is the article I promised, would

সাহিত্য সৈকত

(২৮)

follow my letter to you three days back. Kindly acknowledge.

Do translate it in Bengalee and publish it acknowledging the courtesy of the "Indian Express" in which it will appear for wider circulation.

Yours Sincerely

S. K. Dey

P. S. Do send me a copy of the paper of yours in which this appears.

(৪)

"BulBul"

5, Laj Pat Rai Marg

New Delhi 110024

July 27, 82

Dear Mr Bhattacharya,

Sorry for the delay in sending a reply to your post card dated 24th of last month.

As the article is being printed by you in its translated version in Bengali, you need not mention any other paper's name as courtesy.

The Indian Express could not find room for the article in their Sunday editions as the article falls in a category totally different from what appears there. The Editor of the Sunday

editions has been on leave and hence the delay in their reply with apologies to me.

I may yet try to get the English version published elsewhere but that need have no effect in your Bengalee version.

With my very best wishes and greetings.

Yours Sincerely

S. K. Dey

P. S. Kindly send a complimentary copy of your journal which carries my article to Mrs. Ila Majumder -----
Calcutta 700071 (She is the wife of late Prasanta Majumdar)

(&)

New Delhi

June 9, 83

Dear Mr. Bhattacharya,

Your post card dated June 6. I had written to you on the very day. I received your issue of "Sahitya Saikat" giving you my appreciation. I can not understand why you did not receive it.

I had also written you about the fact that every one in W. B. Govt. and the Minister of Rehabilitation at Delhi had been attested by me with my report in Fulia. No one writes me

from Fulia about what action had been taken. Why don't you ask the people at Fulia to go and meet the minister in a deputation to expedite matters. I have also spoken to the Secretary of the Rehabilitation Minister at the centre. The Secretary is very eager to do something on this. But people at Fulia also must show some interest and anxiety over it. You may take the initiative

Sincerely yours

S. K. Dey

Sri Madhab Bhattacharya

Saikat Sarani

Phulia, Nadia.

(৬)

নিউ দিল্লী

২২শে ন' ৮৩

প্রিয় মাধববাবু,

আপনার চিঠি এবং article পেলাম। খুবই ভালো লাগলো। আমার আগের পোঃ কার্ড মাঠে মারা যাওয়ায় হুঃখিত। কিন্তু দেশের সব কিছুই উলোট পালোটের পথে-ডাক খানাকেই শুধু দোষ দেবো কেন? আপনাদের Post Office টি কি Fulia না Baincha. এই কথাটি একটু পরিষ্কার করে জানাবেন। আমি ত Fulia post office এই আপনাকে চিঠি লিখে যাচ্ছি।

আমি বাংলা সরকারের সবাইর পেছনে এ নিয়ে ঘুরে ঘুরে এখন দিল্লী সরকারের পিছনে লেগেছি। Rehabilitation

Ministry র Secretary ভদ্রমহিলা প্রগতিশীল। তাঁকে অনুরোধ করেছি। তিনি শীঘ্রই তাঁদের officer দের পাঠাচ্ছেন Fulia সামনের মাসের শুরুতে। আমি তাঁকে আমার বাংলা সরকারের কাছে দেওয়া report এবং আমার article এর copy ও দিয়েছি। আপনার article টি কষ্ট করে ইংরেজীতে তর্জমা করে আমার কাছে শীঘ্রই পাঠিয়ে দিন। ওটাও কাজে আসবে। আমি ঠকে পাঠিয়ে দেবো।

এত শীগগির আশাহীন হলে চলবে কেন? এই দেশের লোক এবং মাটির গোড়া এত গভীর যে সাত সাম্রাজ্য একে জীবনের মেরুদণ্ড চ্যুত করতে পারেনি। অষ্টম সাম্রাজ্যও পারেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গে communism ছবছ পরিবর্তনের পথে রাজনীতি হিসেবে। ওতে ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হবে। “বাজালীরা আবার নতুন রাস্তা দেখাবে।” আমি আজই লম্বা এক article পাঠিয়েছি তিন ভাগে ছাপাবার উদ্দেশ্যে Statesman এ। —Bang a-
desh yesterday Today and Tomorrow-part+
one-East & West Pakistan, Part II-Bangladesh,
and after, part III-Bangladesh in Emerging geo
politics. যদি ওঁরা ছাপায় আপনি পড়ে খুশী হবেন। ভারতের পূর্ব অঞ্চল বাংলাদেশ মুক্ত, যুগান্তরের রাস্তায় চলেছে এই আমার সার বক্তব্য ৩২ পাতাতে। Transition এর অবস্থায় উলোচি পালচি গোলমাল হবে বৈকি? আমার ভয় ভাধনা কিছুই নেই-ঐচ্ছ্য ধরে প্রত্যেককে নিজের কর্তব্য নিষ্ঠা নিয়ে পালন করে যেতে হবে। আমি আজ কোনো party সংস্থা কোনো ভাবে কোনো কিছুতেই নেই। তবু আমি আশা

হারাইনি। আমার হৃদয়ের বেদনা আমাকে এগিয়ে নিয়ে চলছে সম্পূর্ণ অচঞ্চল ভাবে। আপনার বয়স এত কম এত সহ-জেন্নেই হাল ছেড়ে দিচ্ছেন কেন? ফুলিয়া শহরের মধ্যবিন্দুদের ভেতর থেকে ছুঁচুর জ্বন খাটি লোককে নিয়ে একটা ছোটো circle বানান। আপনা থেকে এটা বাড়তে থাকবে এবং শক্তি পাবে।

আমি বোধ হয় সেপ্টেম্বরে ২ বা Fortnight এ কলিকাতা আসবো-ওখানকার সরকারের তরফ থেকে নেমতন্ন আছে পঞ্চায়েতীরাঙ্গের অধিকারীদের নিয়ে Training Camp এ যোগ দিতে; আপনি যদি সেপ্টেম্বরের প্রথম ভাগে দিল্লী আসেন ভালো হবে। নিশ্চয়ই আমার বাড়ীতে আসবেন হুপুর বেলা বাঙ্গাল খাবার খেয়ে যাবেন-আলাপ আলোচনার পর। আমার Te ephone :- 62 4836. নমস্কার। আশা হারাবেন না এত শীগগির।

মুরেন দে

(৭)

নিউ দিল্লী

১১ জুলাই' ৮৩

প্রিয় মাধববাবু,

আপনার রেজিস্ট্রী চিঠি এবং অশ্রু চিঠি পেয়েছি। ধন্যবাদ। অনুবাদ ভালো হয়েছে। Rehabilitation মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী মিসেস টি-ভেদীম হোদয়াকে আমি ভালো ভাবে জানি বলে ও'র কাছে আজ সকালে তর্জমা করা article পাঠিয়েছি। উনি ও'র Ministry র কর্মঠ এক Joint Secre-

সাহিত্য সৈকত

(৩৩)

tary কে ফুলিয়া পরিদর্শন এবং বাংলা সরকারের সাথে এ বিষয়ে প্রস্তাব বিনিময় কর্তে আসবেন অদূর ভবিষ্যতে। আশা করি কিছু কাজ হবে। তবে প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় দুই সরকারের দক্ষতার উপর আস্থা এবং বিশ্বাস আমি সম্পূর্ণভাবে হারিয়েছি। জীবনে নিজের কর্তব্য যতখানি আমার সাধ্য এবং আয়ত্তের ভেতর আছে তাই করে যাচ্ছি। আপনিও তাই করুন। আমি আপনাকে পরামর্শ দিচ্ছি নতুন Panchayat Fulia President কে নিয়ে ঔখানকার স্থায়ী ব্যক্তিদের একটা Meeting করে প্রস্তাব তৈরী করে রাখুন। ওটা নিয়ে আপনারা বিনয় চৌধুরী পঞ্চায়ত মিনিষ্টারের কাছে যান উনি ভালো মানুষ এবং যথাসাধ্য সাহায্য করবেন। কেন্দ্রীয় Joint Secretary এলে ওঁর কাছেও আপনারা আবেদন দেন এবং ফুলিয়ার দুর্দশার কথা সরকারের অমানুষিক বেদনাহীনতার ফলে কী হয়েছে সেটা অবগত করান।

শ্রীমাদেব ভট্টাচার্য

আপনাদের শুভাখী

সুরেন দে

১৬ আগষ্ট' ৮৩ নিউ দিল্লী

প্রিয় মাধববাবু,

আপনার লেখা ৩১ তারিখের চিঠি, আপনার বিশেষ চিন্তা-ধারা সহ এসে পৌঁছেছিল কয়েকদিন আগে। এতদিন আপ্রাণ চেষ্টা করার পর কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হয়েছে ফুলিয়ার দায়িত্ব বঙ্গ সরকারের হাতে ছেড়ে দিতে। আমাকে যে কতখানি পরিশ্রম করতে হয়েছে এ সম্পর্কে বুঝানো কঠিন।

কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে না বেরোলে এই ক'শ হর : একে-
বারেই এগোরার জুযোগ পাবে না। পেতে পোয়ে না। আমি
চেষ্টা করছি যাতে Rehabilitation dept. এনা গিয়ে
এটা Panchayat dept. এ যায়। এই dept. এর
Minister এবং Panchayat Director এর সততা এবং
সক্ষমতাতে আমার বিশ্বাস রাখি।

বাস্তালীরা যে বিনামূল্যে পয়সা কিছু পেলেই খুশী হবে এটা
বাস্তালী একচেটিয়া নয়। Rehabilitation এর ব্যাপারে
সর্বত্র ওমনি করেছে। শুধু নিলোখেড়ীতে ও হয়নি, কেননা
ওখানে লোকমত তৈরী হয়েছিল পাকা ভাবে আয়ত্বের বিরুদ্ধে।
ফুলিয়াব জনমত যদি মরে গিয়ে থাকে পুনরুজ্জীবিত করার
সম্ভাবনা থেকে, তা হলে ওর প্রতীকার কেউ করতে পারবেন।

সরকার হস্ত-সীমিত ভাবে কিছু করতে পারে কিন্তু বেশী দূর
এগোতে পারবেন।

Mr. Basu-র Report finalise হয়নি। হওয়ার আগে
(দিন সাতকের মধ্যেই) তিনি আমার সাথে দেখা করতে
আসবেন আলোচনা করতে। অপণার মতামত আমি ব্যক্তি-
গত ভাবে আমার দিক থেকে ওর সামনে রাখবো। কিন্তু
অস্তিত্ব প্রতীকার ব্যাভিচারের বিরুদ্ধে ফুলিয়াবাসীদের উপরই
থাকবে যৌথভাবে। আমার এ সম্পর্কে আর কিছু করারও নেই,
বলারও নেই শুধু কিছুটা Safe guard হস্তান্তর দলিলের
ভেতর অস্তিত্ব করার প্রস্তাব দেওয়া ছাড়া।

আপনি ওখানকার ভেতরকার ২/৪ জন শুদ্ধ মানুষকে নিয়ে
একটা ছোট সংগঠন সৃষ্টি করুন। আমার দৃষ্টি বিশ্বাস বাস্তালী
জাত মরণের পথে এমনি অস্তিত্ব অবস্থায় উপনীত হয়নি যে

সত্যিকার লোক অশ্রার অবিচারের বিরুদ্ধে খাড়া হতে রাজী হবেন। পনেরো তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার article পড়তে পারেন। হয়তো ভালো লাগবে।

আপনাদের কুশল প্রার্থী।

স্বরেন দে

পুঃ-ফুলিয়ার ব্যাপার ভুলে যাবার জ্ঞান আমি একাগ্রভাবে প্রার্থনা করছি। আমার স্নায়ু মণ্ডলী এ সম্পর্কে একটু খোস উঠেছে।

(৯)

নিউ দিল্লী

২৮শে সেপ্টেম্বর '৮৩

প্রিয় মাধববাবু,

আপনার লেখা চিঠি ২৬শে আগস্টের অনেকদিন আগে পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে দেরী হলো। কিছু মনে করবেন না। দোষ আমার নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমাকে নেমতন্ন জানিয়েছিলেন ওঁদের পঞ্চায়েতী রাজ Training Programme এ সাহায্য করার জন্য সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝিতে দিন দেশেকের জন্য ওখানে আসতে। নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। মিনিষ্টার সাহেব বিনয় চৌধুরী মশাই বোলই সেপ্টেম্বর আমার বাড়ীতে এসে ঘন্টা দুয়েক ছিলেন। অনেক আলাপ হলো ফুলিরা শহর সম্পর্কেও। উনি মানুষ খুবই ভালো। কিন্তু আজকের পৃথিবীর পরিস্থিতিতে শুধু মানুষ ভালো হলেই বেশো দূর এগোতে পারেনা-প্রাপের ভেতর একটা অসাধারণ যাতনা-গ্রন্থ আশুন যদি ভেতর থেকে মানুষকে পুড়াতে না থাকে তবে বর্তমান অবস্থায় এগোতে কেউ পারেনা বিশেষ দূর অবশ্য নীচে নেমে পড়া সব সময়ই সহজ। gravity ওতে সাহায্য করে

সাহিত্য সৈকত

(৩৬)

স্বাভাবিক ভাবে।

Minister সাহেব বলেন এবং আশ্বাস দিলেন Programme একটু change হয়েছে। October এর শুরুতে ভূমিকা প্রোগ্রাম হবে তারপর October এর শেষে কিশ্বা নভেম্বরে সারা প্রদেশ জুড়ে programme চলবে। কালই তাঁর নিজের হাতের লেখা চিঠি পেলাম। সারা প্রোগ্রাম নভেম্বরের প্রথম পর্যন্ত স্থগিত করা হয়েছে। আজকের দিনের বাংলা বন্ধ পূজা তাবপর কালীপূজা এ সব নিয়ে সারা October কেটে যায়। এই ভদ্রলোকের প্রাণ এখনও বেঁচে আছে-অনেক কিছু কর্তে চান কিন্তু আমার ভয় communismও হয়ত বাংলাদেশে ঢুকে আগুন হারিয়ে ফেলেছে এবং দাঁতের দংশন করার ক্ষমতাও বোধ হয় ওদের লুপ্ত হয়েছে।

বাংলাদেশ, ভারতবর্ষ আমি শুধু ওসব নিয়ে ভাবছি না-সারা পৃথিবী জুড়ে এ একই Burlesque চলছে-সব। “In the name of people” সে America হোক Europe হোক আর communist জগৎ হোক নিজের স্বার্থে একটু আঘাত কেউ পেতে কিশ্বা আহ্বান কর্তেও চাননা। সবাই চান বর্তমান পরিস্থিতির উন্নতি এবং অগ্রগতি হোক সবাইর, যে যেখানে আছে আর সাথে সাথে যারা জুঁদশা দারিদ্র্যে ভুগছে তাদেরও সাথে সাথে একটু উন্নতি হোক। প্রকৃতির রাজ্যে এ সম্ভব নয়-
“There is no room for something from nothing” যেমনি There is no room for nothing from something” কেউ যদি মঙ্গল চায় সত্যিকার আর তেমনি নিজেকে চালায় তবে তার মঙ্গল আসবেই। পরিবেষ্টনীর অবস্থা চক্রাকারে যেমনি নতুন বায়ু মণ্ডলে এসে পৌঁছাবে

উপ্টোটিও তেমনি সত্যি । এ আমারই নিজের লেখা **Phrase** । এই ভাবনাই আমাকে সান্ত্বনা দেয়, মেরুদণ্ড খাড়া করে চলতে আমার বর্তমান বয়স এবং পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে যদি সম্পূর্ণ একাও আমাকে দাঁড়িয়ে থেকে একথা বলতে হয় বারবার । বিধাতার রাজ্যে ধোকাবাজির জ্ঞান কোথাও নেই । যখন কলকাতা আসবো আপনাকে জানানাবো-**Head master** মশাইকে নিয়ে একটু ছোট খাটো দল সৃষ্টি করার চেষ্টা করুন যাতে আপনারা বর্তমানকার বাংলা সরকারকে বাধ্য করাতে পারেন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানানাবার ফুলিয়া শহর তাদের হাতে হস্তান্তরীত করার কথা । ওখানে প্রস্তাব **State** সরকারের কাছ থেকে না এলেও কেন্দ্রীয় সরকার কিছু এগোতে রাজী নন কেননা, কেন্দ্র একটু এগোলেই তখন মনে করেন **State** সরকার শহরের দৌলত সত্ত্বেও ঝুড়ি নিয়ে দাঁড়াবেন কেন্দ্রের কাছে নতুন ভাবে টাকার খলি পেতে । কেন্দ্র সরকার সম্পূর্ণ ভাবে হাত খোলে শহর ওদের দিয়ে দিতে প্রস্তুত ।

আমি এই ব্যাপার নিয়ে গত ছ'মাস অবিশ্রাম চেষ্টা করে বর্মাক্ত হয়ে আছি । ফুলিয়াবাসীদের তরফ থেকে একটু জীবনী শক্তির প্রভাবের প্রয়োজন এসেছে ।

আপনাদের—

এস. কে. দে

(১০)

নিউ দিল্লী

২৯শে অক্টোবর' ৮৩

মাধববাবু,

আমি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খবরের প্রতীক্ষায় আছি তারপর **West Bengal** এ আসার **Programme** আমার নিশ্চিত

সাহিত্য সৈকত

(৩৮)

হবে। এ সরকারের সততাতে আমি বিশ্বাস আজও রাখি অন্ত-
 ম্নত লোকদের সাহায্য সম্পর্কে। কিন্তু ওদের কাজ করার দক্ষতা
 সম্পর্কে বিশ্বাস আমি হারিয়ে ফেলেছি। যদি আসি, নভেম্বরে
 দেখা হলে আলোচনা হবে। আপনি ফুলিয়ার
 সংলোকদের নিয়ে deputation এ যাবার চেষ্টা
 করুন পঞ্চায়ত এবং পুনর্বাসন মন্ত্রীদের কাছে। ওঁরা কেন্দ্রীয়
 মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ না করলে কেন্দ্র কিছুই করবে না। আমার
 সাধ্যমত ওঁদের রাজী করিয়েছি যদি State সরকার ওদের
 Transfer এর জন্য অনুরোধ এবং অনুরোধ জানায়। বাকী
 ব্যাপার আজ ফুলিয়ার লোকদের হাতে এবং তাঁদের নেতাদের।

Mainstream 22nd এবং 29th October এ আমার
 বিশদ লম্বা article "Bangladesh Retrospect and
 Prospect" সম্পর্কে বেরিয়েছে with bearing on
 politics of the whole East.—পড়বেন এবং আনন্দ
 পাবেন। আপনার কাগজে condense করে ছাপাতেও
 পারেন।

শূরেন দে

শ্রীমাতব ভট্টাচার্য

সৈকত সরণী, ফুলিয়া

পুনঃ:- আমার বিজয়া দেওয়ালীর স্নেহ ভালবাসা নিবেন
 এবং হেডমাষ্টারমশাইকে জানাবেন।

(১১)

New Delhi

Nov. 17, 83

Dear Mr. Bhattacharya,

Your letter dated Nov. 2 arrived here only
 today. I do not really know where the country
 is being led.

সাহিত্য সৈকত

(৩৯)

You must meet Shri Benoy Chowdhury in a deputation unless people begin to assert for themselves no Government ever will move here. They all seem to arrive their goal, sadly, too soon what I can an individual do. The time for collective action approaches fast, failing which we shall get ourselves lost as a nation.

I can come only when the W. B. Govt. arrange their training programme for P. R. office bearers, which was to take place two months back and which is yet to be finalised.

I believe, I wrote you sometime back an article— 'Bangladesh retrospect and prospect' appeared in my name in "Mainstream" of Oct. 22 & Oct. 29. please read. You will find of great interest.

Sincerely

S. K. Dey

(১২)

New Delhi

May 18, 84

My dear Madhab Babu,

Your book size Jan-March issue had come. I thoroughly enjoyed it. My compliments.

Kindly refer to an article—

"The dream and Reality" by me on the May

19 issue of *Mainstream*. It starts with Nilokheri and Fulia as the introduction and deals summarily and most bluntly with the politics, economics and the socialist stagnation across India as a whole. This I thought. You would find interest for publication with due acknowledgement to "*Mainstream*" in the next issue of your journal. You may translate the article in Bengali which will be more forceful in your pen. Do drop me a line.

Yours sincerely
S. K. Dey

(১৩)

নিউ দিল্লী

১৬. ১০. ৮৪

প্রিয় মাধববাবু,

এবারকার 'সাহিত্য সৈকত' খুবই ভালো হয়েছে। আমার article এর তজ্জমা এবং সংক্ষেপকরণ অসাধারণ হয়েছে। অন্য article গুলোও ভালো লাগলো।

আপনি Fulia র নেতাদের নিয়ে একবার বেঙ্গল সরকারের সাথে আন্দোলন করুন ফুলিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে।

আমার আর কিছু করার নেই। যা করার ছিলো করে আমি এ বিষয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছি— নিজের কাছে স্বীকার করছি। 'সাহিত্য সৈকতের' এবারকার একটা copy Mrs. Ila Mazumdar... — — —'র কাছে পাঠিয়ে দেবেন। উনি ৮প্রশান্ত মজুমদার মহাশয়ের স্ত্রী-যিনি ফুলিয়ায় কৃষি বিষয়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। নমস্কার, বিজ্ঞার নমস্কার গ্রহণ করুন।

এস, কে, দে

সাহিত্য সৈকত

(৪১)

সেকালের বুদ্ধিজীবী ও স্বদেশ

সাধক : কয়েকটি কথা

হরপ্রসাদ মিত্র

উনিশ শতকে এদেশে ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজ বিষয়ে যে ভাবনার ঢেউ রামমোহন থেকে শুরু করে শতাব্দীর শেষ সীমা অতিক্রম করে বিশ শতকের প্রথম পাদান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত ছিল, সেই সময়ধারার মধ্যেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয় কুমার দত্ত, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব চন্দ্র সেন আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু ও তাঁর পিতা নন্দকিশোর, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং আধো অনেকের নাম প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় (১৮৬১- ১৯০৭) একজন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী হিসেবেই আধিক প্রসিদ্ধ বটে, কিন্তু বাংলার বিদ্বৎসমাজে ব্রাহ্ম প্রগতিবাদ ও হিন্দু-প্রগতিবাদ হৃদিক থেকে তাঁর নামও প্রাসঙ্গিক। শুধু তাই নয়, তাঁর মধ্যে ছিল স্বাধীন চিন্তার হৃদমণীয় এক অন্তরিতা এবং সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের গভীর প্রেরণা যা ছিল তাঁর দেশপ্রেমের প্রধান একটি দিক। অতএব অনেক নামের তালিকা ব্যতিরেকেও সংক্ষেপে সে যুগের বুদ্ধিজীবীদের কথা স্মরণ করতে গেলে কিছু নাম বাদ গেলেও মূলকথার কোনো বিকৃতি ঘটবে না বলেই আশা করা যায়। আধ্যাত্মিক অর্থে যৎপরোনাস্তি স্বাধীন ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব।

প্রয়াত বিনয় ঘোষ তাঁর ‘বাংলার নবজাগৃতি’ বাংলার বিদ্বৎসমাজ প্রভৃতি বইয়ে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালী

সমাজে বণিক শ্রেণীর মধ্যে ঘোড়দৌড় ও অগ্ন্যাশু জয়্যার্থের রেওয়াজের উল্লেখ করেছেন। ছাত্তুবাবুর দৌহিত্র শরৎবাবু, লাটুবাবুর পোস্ত পুত্র মন্মথবাবু, হাটখোলার দত্তবাবুরা যে উত্তর কলকাতার পোস্তার রাজাদের বাগানে ঘোড়দৌড়ে যোগ দিতেন, সে কথা তিনি দেখিয়েছেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের ‘পুৰাতন প্রসঙ্গ’ থেকে। একদিকে এই রকম নানা বিনোদনের আয়োজন, অন্যদিকে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে স্থার উইলিয়ম জোনস্ কর্তৃক ‘এশিয়াটিক সোসাইটি’ স্থাপন থেকে শুরু করে ১৮১৫ তে রামমোহনের ‘আত্মীয় সভা’ ‘ইউনিটোরিয়ান সোসাইটি’ (সেপ্টেম্বর ১৮১১), ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ (আগষ্ট ১৮২৮), ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের কেক্রয়ারীতে ‘গৌড়ীয় সমাজ’—১৮২৯-এর ৪ঠা ডিসেম্বর বেষ্টিক্স সতীদাহ ও সহমরণ বেআইনী ঘোষণা করার ফলে ১৮৩০-এ সনাতন পন্থীরা ধর্ম রক্ষার্থে ‘ধর্মসভা’ স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে ‘হিন্দু কলেজ’ স্থাপিত হয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২০ এ জানুয়ারী। ‘ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি’ (জুলাই, ১৮১৭) এবং ‘ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি’ (সেপ্টেম্বর ১৮১৮) হয় বিদ্যালয়ের সংস্কার এবং নতুন শিক্ষার উপযুক্ত গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্যে। ইংরেজদের ও দেশীয় লোকের সম্মিলিত চেষ্টায় আরো নানাবিধ সভা-সমিতি হয়। হিন্দু কলেজের ছাত্ররা বেকন, লক, বার্কলে, হুইম, রীড, স্টুয়ার্ট প্রভৃতির দর্শন পড়ে উগ্র স্বাধীন চিন্তায় বিশ্বাসী তখন। এইভাবেই ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ‘ইয়ং বেঙ্গল’ দল পরাক্রমশালী হয়ে ওঠে এবং মোটামুটি ১৮৫০ পর্যন্ত ছিল এদের প্রতাপের বিস্তার।

১৮২৬-এ পোতুগীজ পরিবারের সম্ভান এবং গুরু ড্রামস্তের শিষ্য হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও মাত্র সতেরো বছর বয়সে

হিন্দু কলেজের শিক্ষক হয়ে আসেন। অতএব হিন্দু কলেজে যোগ দিয়ে তিনি তাঁর প্রায় সমবয়সী অনেক ছাত্রকে পান এবং রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি ছিলেন তাঁর সাক্ষাৎ ছাত্র। ডিরোজিও বেকনের আদর্শে স্বাধীন চিন্তার ও মুক্ত মনে জ্ঞানান্বেষণের অমুরাগী ছিলেন। তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে সিক্কাস্তের দিকে এগিয়ে যাওয়াতেই এই শিক্ষক ও তাঁর ছাত্রদলের আগ্রহ ছিল সমধিক। ১৮২৭-২৮ খ্রীষ্টাব্দে গড়ে ওঠে তাঁদের ‘অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন’। ডিরোজিওর বৈঠকখানা থেকে এই সভা পরে উঠে যায় শ্রীকৃষ্ণ সিংহের মানিক-তলার বাগানবাড়ীতে। এই সভার সভ্যদল তখনকার সামাজিক নৈতিক, ধর্ম সম্পর্কিত তর্ক করতেন খুবই উৎসাহের সঙ্গে। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি অনেকেই এই অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশনে নামী বাগ্মী হয়ে ওঠেন। ১৮৩০-এর ৯ই নভেম্বর রামমোহন বিলেত যাত্রা করার এক মাসের মধ্যেই ২৬-এ ডিসেম্বর ডিরোজিওর মৃত্যু হয় এবং ১৮৩৩-এর ২৭ এ ডিসেম্বর ব্রিস্টলে রামমোহনেরও মহাপ্রয়াণ ঘটে যায়। তার আগেই ১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দেই টম পেইনের ‘রাইট্‌স অফ ম্যান’ এবং ‘এক্স অফ রীজন্’ পড়া হতে থাকে দেশের নবজাগ্রত তরুণদের মধ্যে। ঐ পর্বের নানা পত্র-পত্রিকায় তখনকার ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধেও এঁদের নানা মন্তব্যের খবর আছে। ১৮৪৩-এ প্রতিষ্ঠিত হয় ‘বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি’। তাব আগেই স্থাপিত হয়েছে ‘সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা’ (১৮১৮), ‘তত্ত্ববোধিনী সভা’ (১৮৩৯)। এইভাবে বিদ্যাচর্চা ও সমাজচিন্তার উত্তম ছড়িয়েছিল সে- পর্বে।

ব্রহ্মবান্ধব (১৮৬১-১৯০৭) ছিলেন শতাব্দীর শেষার্ধের জাতক হুগলী জেলার খম্বা ন গ্রামে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী হবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পক্ষের নান্দীর গর্ভে দেবীচরণ, কালীচরণ, ও তারিণীচরণ,-এই তিন পুত্রের জন্ম হয়। দেবীচরণের কনিষ্ঠ পুত্রের নাম ভবানীচরণ। এই ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ই পরে হন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। শৈশবেই তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। তাঁর পিতা দেবীচরণ ছিলেন পুলিশের উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তি। শৈশবে স্বগ্রামে পীতাম্বর পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে, পরে পিতার সঙ্গে তাঁর কর্মস্থল নানা জায়গায় ঘুরেছিলেন ভবানীচরণ। এর পরে চুঁচুড়ায় হিন্দু স্কুলের, হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলের অর্থাৎ কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। তারপর কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশনে এবং শেষে হুগলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৭৬ এ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর হুগলী কলেজে ঢোকবার পরে শরীরচর্চায় এবং ভাটপাড়াতে সংস্কৃত চর্চায় উদ্যোগী হন। অতঃপর তাঁর অগ্রজ হরিচরণ যখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র তখন তিনি জেনারেল অ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশনের কলেজ-বিভাগে ভবানীচরণকে ভর্তি করে দেন। সেখানে নরেন্দ্রনাথ দত্তকে (পরে বিবেকানন্দ) সহপাঠী রূপে পান ভবানীচরণ। এইভাবে বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর যোগ ঘটে যায় এবং ঐ সময়েই আনন্দমোহন বসু, নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে তিনি পরিচিত হন।

তাঁর ধর্মচিন্তাতে ছিল প্রবল ঔৎসুক্য, তেমনি তাঁর রাজনীতিচিন্তাতেও ছিল সহিংস বিদ্রোহের প্রেরণা। ইংরেজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সৈনিক হবার আশায় তিনি কলকাতা থেকে

গোয়ালিয়রে যান অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে। সে-কাহিনী তাঁর 'আমার ভারত উদ্ধার' নামে রচনায় পাণ্ডয়' যায়। পর পর ছ'বারই তাঁর এই যাত্রা নিষ্ফল হয়। এদিকে বিদ্যাসাগর কলেজে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শুনে তিনি দেশ প্রেমে অনুপ্রাণিত তখন। আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি ছিলেন তাঁর পিতৃব্য কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বন্ধু। আনন্দমোহন তাঁকে সহিংস বিজ্রোহের পথ ছেড়ে নিয়মানুগ আন্দোলনের পথে স্বাধীনতার চেষ্টা করাই যে সমীচীন, সে কথা বোঝাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে তিনি পরিতৃপ্ত হননি। গোয়ালিয়ার থেকে দ্বিতীয়বার ফিরে এসে বর্ধমানের মেমারিতে এবং কলকাতায় বছর খানেক 'স্ট্রীট চার্চ ইনস্টিটিউশনে' শিক্ষক ছিলেন তিনি। ফরাসীতে ও হিন্দী ভাষায় তিনি এই সময়ে কতকটা অধিকারী হয়ে ওঠেন।

১৮৮০-৮১ তে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান সমাজের সর্বধর্ম সম্মেলনের প্রয়াসে তিনি খুবই আকৃষ্ট হন এবং কেশবচন্দ্র ও রামকৃষ্ণ পরমহংস উভয়েরই সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি। রামকৃষ্ণকে তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ বলে গেছেন। যে-বছর রামকৃষ্ণের তিরোধান ঘটে, সেই ১৮৮৬ তে 'ভবানীচরণ 'কংকর্ড' ক্লাব স্থাপন করেন—যার উদ্দেশ্য ছিল যুবসমাজের শারীরিক মানসিক সার্বিক উন্নতিসাধন। এই ক্লাবের মূখ্যপত্র হয় প্রথমে সাপ্তাহিক ও পরে মাসিক 'কংকর্ড'। ১৮৮৭ পর্যন্ত এটি চলেছিল। সেই ১৮৮৭-র ৬ই জানুয়ারি ভবানীচরণ নববিধান ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

এই সময়ের অল্পকাল পরে হীরানন্দ নামে সিদ্ধুদেশের এক অধিবাসী যিনি কলকাতায় ছাত্রাবস্থায় কেশবচন্দ্রের সংস্পর্শে

আসেন, তিনি সিদ্ধুদেশের হায়দ্রাবাদে এক ইংরেজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে ১৮৮০ তে ভবানীচরণ সেখানে গিয়ে সেই 'ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি' তে সংস্কৃত অধ্যাপনায় যোগ দেন। তার আগেই তাঁর পিতৃব্য কালীচরণের খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ ঘটে গেছে এবং ভবানীচরণ তাতেও আকৃষ্ট হন। ইউনিয়ন অ্যাকাডেমিতে শিক্ষকতা পূর্বে ভবানীচরণ খ্রীষ্টীয় ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করেন। কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টীয় উৎসবগুলি অনুষ্ঠিত হোতো,—পিতৃব্য কালীচরণের প্রভাবও স্বীকার্য এবং ভবানীচরণের নিজের ধর্মপ্রাণতার বৈশিষ্ট্যও ধর্তব্য। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের বড় দিনে যীশু সম্বন্ধে তিনি এক বক্তৃতা দেন, তারপর ১৮৯০-এর মে মাসে শিক্ষকতায় ইস্তফা দিয়ে অন্যত্র বাস করতে থাকেন। সেখানে খ্রীষ্টতত্ত্বের আলোচনা চলতে থাকে। লেখরাজ 'থেমটাদ' হেথার্টাদ প্রভৃতি সিদ্ধী যুবক তাঁর শিষ্য হন। ১৮৯০-এর আগষ্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত 'দি হার্মনি' নামে এক পত্রিকা চালিয়ে খ্রীষ্টান ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা প্রকাশ করেন তিনি এবং হিন্দুধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের সমন্বয় প্রয়োগে কেশবচন্দ্রের বরণীয় নেতৃত্বের প্রশংসা উল্লেখই শুধু নয়, তিনি লেখেন যে সে যুগে কেশবচন্দ্র সেন-ই ছিলেন ঈশ্বর-প্রেরিত শ্রেষ্ঠ পুরুষ। ১৮৯১-এর ২৬-এ ফেব্রুয়ারি ভবানীচরণ হায়দ্রাবাদে (সিদ্ধু প্রদেশে) প্রোটেষ্ট্যান্ট খ্রীষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত হন। ফলে সেখানকার ব্রাহ্মসমাজে খ্রীষ্টান ধর্মের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। সেট বছরেই ১লা সেপ্টেম্বর তিনি করাচীতে গিয়ে রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হন। হায়দ্রাবাদে এবং করাচীতে আন্দোলন চললেও ১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে তিনি সম্মুখস অবলম্বন করেন এবং তখন তাঁর নাম হয় ব্রহ্মবন্ধু—পরে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ১৮৯৪-এর জানুয়ারি থেকে ১৮৯৯-অবধি 'সোফিয়া' নামে এক মাসিক পত্র চালান তিনি এবং তাতে বলা হয় যে, বেদান্তের ভিত্তিতে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রচার দরকার। ১৮৯৫ থেকে অ্যানি বেসান্টের খ্রিস্টসংস্কৃতি-আবৃত্তি হিন্দুধর্ম ব্যাখ্যার বিরোধিতা

করেন, তিনি এবং কলকাতায় এসে ঐ সময়ে খালি পায়ে গেরুয়া-
 ধারী সন্ন্যাসী বেশে শোলকরতাল নিয়ে পথে-পথে যীশুর নাম-
 কীর্তন করেন। ১৮৯৯-এর জামুয়ারীতে জব্বলপুরে নর্মদা তীরে
 তিনি এক ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদের মঠ স্থাপনও করেন, তবে সে
 মঠ দু'তিন মাসের মধ্যেই উঠে যায়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে কল-
 কাতায় ফিরে আসেন তিনি। ঐ সময়ে 'সোফিয়া' সাপ্তাহিক
 পত্রিকার ১লা জুন সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'দি ওয়ার্ল্ড পোয়েট
 অফ বেঙ্গল' নামে এক প্রবন্ধ লেখেন। পরে ২৮ এ মে, ১৯০১
 তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকায় এই প্রবন্ধের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ
 করেন কালিদাস মুখোপাধ্যায়। ৮ই ডিসেম্বর ১৯০০ এই
 'সোফিয়া' পত্রিকা উঠে যায়। কিন্তু ১৯০১-এর ১১ এ জামুয়ারি
 তার বন্ধু নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদনায় বেরোয়
 'টোয়েন্টিয়েথ সেকুরি' নামে এক মাসিক পত্রিকা যার জুলাই
 সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদকে এক প্রবচন
 লেখেন। বাংলা ১৩০৮ সালের বৈশাখে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদনায়
 যখন নবপর্ষায় 'বঙ্গদর্শন' বেরোয় তখন প্রথম সংখ্যাতেই হিন্দুর
 একনিষ্ঠতা সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদবের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তখন
 কলকাতায় প্রাক্তন ছাত্র কার্তিক চন্দ্র নানের বাড়িতে এবং পরে
 সিমলা স্ট্রীটের এক বাড়িতে ব্রহ্মবাদবের আদর্শ-বিদ্যালয় চলছে।
 রবীন্দ্রনাথ কার্তিকচন্দ্র নানের বাড়িতে তাঁর সঙ্গে মিলিত
 হতেন। বোলপুরে শান্তিনিকেতন আশ্রমে এক আদর্শ বিদ্যালয়
 গড়ে তোলবার বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা জানে ব্রহ্ম-
 বাদকে কয়েকটি অনুগত শিষ্য ও ছাত্র নিয়ে সে কক্ষে যোগ দেন।
 'আত্মপরিচয়'-নিরক্ষমালায় তাঁর উল্লেখ আছে—রবীন্দ্রনাথের
 নিজের কথায়—“ব্রহ্মবাদকে উপাধ্যায় তখন আমার সহায়
 ছিলেন—তখন তাঁহার মধ্যে রাষ্ট্রনৈতিক উৎসাহের অক্ষুরমাত্রও
 কোনও দিন দেখি নাই—তিনি তখন একদিকে বেদান্ত অগ্রাদিকে
 রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টান ধর্মের মধ্যে নিমগ্ন ছিলেন।”

এই সময়ে ১৯০২-এর ৪ঠা জুলাই স্বামী বিবেকানন্দের

তিরোধান ঘটে। বোলপুর থেকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে এই খবর পারার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব যুরোপ গিয়ে বেদান্ত প্রচারে আগ্রহী হন এবং ঐ বছর ৫ই অক্টোবর যাত্রা করে ইটালি হয়ে তিনি ইংলণ্ডে অক্সফোর্ডে এবং কেম্ব্রিজ গিয়ে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯০৩-এর জুলাই মাসে তিনি বোধ হয় কলকাতায় ফেরেন। ‘বিলাত-যাত্রী সন্ন্যাসীর চিঠি’ (সেপ্টেম্বর, ১৯০৬) নামে তাঁর দশটি চিঠির সংগ্রহে বিলেতে তাঁর কীর্তিকলাপের কথা আছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ডন-সোসাইটির এক সভায় তিনি নিজের বিলেতের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। ‘বিনয় সরকারের বৈঠক’-এ অধ্যাপক বিনয় সরকার সেই ভাষণের চমৎকারিছের কথা লিখে গেছেন।

দেশে ফিরে ১৯০৪-এর ১৬ই ডিসেম্বর ব্রহ্মবান্ধব ‘সন্ধ্যা’ দৈনিকপত্র প্রকাশ করেন। ‘ডন’-সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অন্তর্দিকে বিপিনচন্দ্র পাল, ভগিনী নিবেদিতা, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরস্বতীদেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি তখন দেশের যুবমানসের প্রেরণাশূল। ১৯০৭-এর ১০ই মার্চ ব্রহ্মবান্ধব ‘স্বরাজ’ নামে এক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। স্বদেশী আন্দোলন তখন তুঙ্গে। বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘটে গেছে ১৯০৫-এর ১৬ই অক্টোবর। ‘স্বরাজ’ পত্রিকার প্রত্যেক সংখ্যায় ছত্রপতি শিবাজীর ছবি ছাপা হতো। ‘সন্ধ্যার’ কতকগুলি প্রবন্ধের মধ্যে ‘এখন থেকে গেছি প্রেমের দায়’ প্রভৃতির জন্যে ব্রহ্মবান্ধবের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি কালীঘাটে প্রারম্ভিক করে উপবাস্ত বারণ করে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের এজলাসে গিয়ে বলেন যে ঈশ্বর নির্দেশিত স্বরাজ-আন্দোলনে তিনি তাঁর ভূমিকা অবশ্যই পালন করেছেন, কিন্তু বিদেশী শাসকের কাছে সে বিষয়ে কোনো জবাবদিহি করা তাঁর কর্তব্য নয়।

এই পরিস্থিতিতে ক্যাথল হাসপাতালে এক অস্ত্রোপচারের ফলে অকস্মাৎ ২৭ই অক্টোবর, ১৯০৭ তাঁর মৃত্যু ঘটে যায়।

ভাবে ডেপুটেশনের নামে অফিসের ভিতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এবং উক্ত অফিসের আধিকারিক জীপি, কে, মণ্ডলকে নিগৃহীত করে। স্থানীয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কোন বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। সুষ্ঠুভাবে অফিস চালানো অসম্ভব হচ্ছে।

ওষেষ্ঠ বেঙ্গল এমপ্লয়মেন্ট অফিসান এসোশিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক মহঃ ইসমাইল এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানাচ্ছেন সমিতির তরফ থেকে তারা স্থানীয় প্রশাসনের নিকট স্মারকলিপি পেশ করেছেন। আশু ব্যবস্থা না হলে তারা সমিতির পক্ষ থেকে আন্দোলনের পথে এগিয়ে যাবেন।

শাড়ী কুঠির



টাকাইল শাড়ীর অভিজাত প্রতিষ্ঠান।

ফুলিয়া বাসস্ট্যাণ্ড, চটকাতলা।

ফোন : ফুলিয়া ৩৮/৩৯

কলকাতা বিজয়কেন্দ্র টেলিফোন : ৪২-৮০৮৭



॥ প্রোঃ- ননী গোখাল দাস ॥

এ জীবন বড় লোভনীয়

ঈশান চন্দ্র মিশ্র

অরণ্য তোমার গান নিয়ত ধ্বনিত হয়

আমাদের অবরুদ্ধ মনে,

চঞ্চলা ঝরণার আঁকা বাঁকা গতি

প্রতিক্ষেপে

আনে শিহরণ যেন দুঃসহ লোভাতুরা সৌন্দর্য

জীবনের দিনগত পাপক্ষয় ধারণায়,

আনে কমনীয়তা পেলবতা সরল ঔদার্য্য।

জীবন তুমি অরণ্যচারী হয়ে যাও

ঝরণার জল মিঠে ফল পাতার ঘর

গলাগলি ভালবাসা লোভহীন প্রেম

তারপর

প্রতিটি পাতার কাঁপুনে ছায়ায়

অনন্ত আনন্দ মাখা শিরশিরি

হিমেলতায়

আমার পাপবিদ্ধ মনের আবর্জনা

তিরতির ঝরণায় ক্ষয়ে যাক সব

আতুড় গায়ে বনানীর ঐশ্বরিক অনন্ত প্রেমে

লীন হতে হতে

ধূঞ্জে পাই কিছু বড় লোভনীয় ক্ষণ

পড়ে থাক নগর শহর পিছনে দৃষ্টির বাইরে

অব্যক্ত আনন্দ শুধু—

নীল আকাশের নীচে

উন্মুক্ত জীবন।

হাওয়া যাচ্ছে বয়ে

সুজিৎ কুমার রায়

দেখলে তো,

রাতারাতি হাওয়ার কি পরিবর্তন !

মাঠে, মরুদ্যানে সবখানে

এখন অনাবিল হাওয়া ।

যে শিশুবা গুমটে

কৈঁদে ভাসাচ্ছিল বুক ;

তাদের বৃকের ভিতর দিয়ে

এখন বয়ে যাচ্ছে অরণ্যের হাওয়া ।

দেখলে তো,

যন্ত্রণার সমুদ্রে

পৃথিবী শাসিত হল ;

পুনর্জন্ম হল সূর্যের ।

শরতের এই মধ্যরাতে

কেউ কোথাও জেগে নেই—

শূন্যমাঠ, প্রান্তরে, সমুদ্রে

আকাশের অনন্তনীলে

এখন প্রভূত হাওয়া যাচ্ছে বয়ে।

পুণ্যস্নান

কাম্পী নাথ সাহা

ডুব দিয়ে চরিতার্থ করেছি হৃদয়

গঙ্গায় বয়ে গেছে বহমান শ্রোত

পাপবোধ তবু কেন শরীরে আমার

দ্বিতীয়বার ডুব দিয়ে উঠে

আমি কি পাবো আমার লালিত প্রত্যাশা ?
 আমি তো নিঃকলঙ্ক নই, এখন
 পবিত্র নই শৈশবের মতো
 বয়ঃসন্ধিতে কিছু পাপ জন্মেছে শরীরে
 শ্রাওনার মতো সারা শরীরে জড়ানো ।
 সেই পাপ ধুয়ে দিতেই পবিত্র জলে
 ভিজিয়েছি শরীর । এখন
 হে ঈশ্বর তুমিই বলে দাও
 আমি কি ফিরে পাব শৈশবের
 বিশুদ্ধ নিঃকাম শরীর

শ্রেম-হৃৎ-ভালবাসা

কাকলি ভট্টাচার্য

এই পৃথিবীর ভালোবাসার
 সাধ জাগালে কে গো তুমি !
 মরুভূমির মরু তৃষায়
 কে যোগালে মিঠাপানি ?
 বৃকের রক্ত হিম হয়ে যায়
 কে দিলে আজ উষ্ণ জোয়ার !
 দিল দরদী তুমিই নারী
 ভরিয়ে দিলে ভালবাসায় ।
 নিজের কণ্ঠে পরিয়ে দিলে
 অগ্নিমালা আপন মনে
 প্রাণ হাহাকার মুখ কোটে না
 বুক যে ভরা অভিমানে ।
 বিষের ডালা তোমার হাতে
 অমৃত পাত্র বিলিয়ে দিলে

হিসেবের খেই হারিয়ে গেল
ডুব দিলে যে অধৈর্যে ।

শাস্তির সুখের পায়রা

উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায়

সুখের পায়রা

বুকের ভিতর পোষা, অথচ

বুকের খাঁচা

ততখানি চওড়া নয়

যতখানি হলে

ডানা কাপটাতে পারে

বুক ভর্তি ভালবাসার

দানাপানি খেতে পারে

খুটে খুটে, ঘুরে ফিরে ।

কিন্তু তবু

অপরিসর খাঁচার ভিতর

যখন ডানা কাপটায়

বুকের ব্যথাটা বড় বেড়ে যায়

দানাপানি খুটে খেলে

সুখের পায়রা হয়ে যায়

বুনো কাঠ ঠোকুরা ।

একদিন তাই

ছেড়ে দেওয়া ভাল

কোনো না কোনো বাহানায়

উড়ে যদি যায়, যাক

বুকের ভিতরটা খালি হয়ে গেলেও

বড় শান্তি পাওয়া যায় ।

বরীমুখ

পন ভট্টাচার্য

মাণি কুম্মাদপি, বৃক্ষে মুখ অরণ্যানী
ভ বৈরী বৈরাগ্যে আরোগ্য হোক মহাজন,
এ জন্মে সাহস কর নিজেকে ভাবো কীটানুকীট
কতায় কষ্ট আনো, ক্লিষ্ট হও, পত্রে পত্রে
খেয় রেখায় ক্লোরোফিল হও, সূর্য চেনো, চন্দ্র চেনো
শখর মুখ হয়েও যেন গলে যেও না মন্থা গায়,
পক্ষে পক্ষে পুষ্প ফোটাও, এই ধামে অধম অনেক
আছেন কিন্তু তাদের মুখে ছাই দিয়ে বিচরণ করো
ম্য হর্মে, যেন-তোমার রক্ত না হয় মদ্যপায়ী।
আরক্ত মুখ, লুটায় বসন, শিথিল খোঁপায় আবিহুতা
দেখতে পেলে তাকে বোলো এইবার নারী বন্ধুত্ব হও ;
বন্ধুত্ব হও অসংযত বৈরী আমার—গৌর গৌর,
কালসপ ঘুরছে এবার সাপের সামনে আনাও ময়ূর।

টুকরো খবর

মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

এ বছর ফুলিয়া শিক্ষানিকেতনের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ফলাফল স্কুলের রেকর্ডে নজির সৃষ্টি করেছে। শিক্ষানিকেতন থেকে এ বছর পরীক্ষা দিয়েছিল ৮২ জন ছাত্র। এর মধ্যে ৮০ জন ছাত্রই পাশ করেছেন। প্রথম বিভাগে ১৪, দ্বিতীয় বিভাগে

সংক্রামক রোগ প্রতিষেধক টিকার সময়সূচী

টিকা কাদের জন্য বয়স টিকা সেব্য মাত্রা (ডোজ) টিকা কিভাবে প্রয়োগ করতে হবে

নবজাত	৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	ডি পি টি	৩	ইঞ্জেকশন
	৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	পোলিও	৩	খাওয়াতে হবে
শিশু	৬ সপ্তাহ থেকে ৯ মাস	বি সি জি	১●	ইঞ্জেকশন
	৯ মাস থেকে ১২ মাস	হাম	১	ইঞ্জেকশন
শিশু	১৬ থেকে ২৪ মাস	ডি পি টি	১●●	ইঞ্জেকশন
	১৬ থেকে ২৪ মাস	পোলিও	১●●	খাওয়াতে হবে
শিশু	৫ থেকে ৬ বছর	ডি টি	১L	ইঞ্জেকশন
	১০ বছর	টি টি	১L	ইঞ্জেকশন
শিশু	১৬ বছর	টি টি	১L	ইঞ্জেকশন
	১৬ থেকে ৩৬ সপ্তাহ (গর্ভাবস্থা)	টি টি	১L	ইঞ্জেকশন

গর্ভবতী মহিলা

১০০

১. অঙ্গাগে থেকে টিকা দেওয়া না থাকলে ২ মাত্রা।

বিঃ দ্রঃ—দুটি মাত্রা (ডোজ) প্রয়োগের মধ্যে কমপক্ষে একমাস সময়ের ব্যবধান রাখতেই হবে। অল্প কালি, ঠাণ্ডা লাগা বা সামান্য জ্বরে টিকা দিতে কোন বাধা নেই।

মাস মিডিয়া, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, গঃ বঃ সরকার। বিজ্ঞাপন সংখ্যা ১৬৩/৮২-২০

“সাহিত্য সৈকত” এর
রামায়ণ বিষয়ক সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

৪৬ এবং তৃতীয় বিভাগে ২০ জন পাশ করেছেন। ৫টি বিবাহ
লেটার পেয়ে স্টার নম্বর নিয়ে পাশ করেছেন তুলসী বসু
(৬৭৬)। বালিকা বিদ্যালয় থেকে পরীক্ষা দেয় ৮৫ জন ছাত্রী
পাশ করেন ৬৯ জন। প্রথম বিভাগে ৪, দ্বিতীয় বিভাগে ২;
তৃতীয় বিভাগে ৪৪ জন। স্বাতী ঘোষ (৬২৩) সব থেকে বেশি
নম্বর পেয়েছেন।

বিদ্যামন্দির কো-এডুকেশন স্কুল থেকে এবারট প্রথম
মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসে মোট ৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী। এর মধ্যে
৪৩ জন ছাত্র বাকী ৭ জন ছাত্রী। পাশ করেছেন ২৭। প্রথম
বিভাগে ২ জন, দ্বিতীয় বিভাগে ৯ এবং তৃতীয় বিভাগে ১৪ জন।
পার্থপ্রতিম ঘোষ (৫৯১) সব থেকে বেশি নম্বর পান।

নাট্য শিল্পী এবং নাট্য সংস্থাদের আর্থিক সাহায্য দান

পশ্চিমবঙ্গের স্থায়ী বাসিন্দা এবং নাট্য চর্চার ক্ষেত্রে কর্মরত
যে সব স্তম্ভগী শিল্পী, শিল্পনংস্থা ও নাট্য প্রযোজনায় সঙ্গে যুক্ত
ব্যক্তি বা দলগুলি অর্থিক দুরবস্থার মধ্যে রয়েছেন তারা
নাট্য অ্যাকাডেমির কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেতে পারেন।

বিস্তারিত বিবরণের ক্ষণ্ড ৩০/১/৮৯ এর মধ্যে জেলা তথ্য-
অধিকারিক অথবা অ্যাকাডেমির বাগবাজারস্থিত অফিসে আগ্র-
হীরা যোগাযোগ করতে পারেন।

বিনিয়োগ কোল্ড দালালদের উৎপাত

ইদানীংকালে রানাঘাট, ঝাড়গ্রাম, বালুরঘাট, কৃষ্ণনগর এবং
বসিরহাট কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রে সমাজবিরোধী, দালালদের
উৎপাত বেড়ে চলেছে। গত ৮. ৮. ৮৯ রানাঘাটে কিছু
দালাল কর্মবিনিয়োগ আধিকারিক শ্রী এ. কে. রায় এবং শ্রী টি.
পি. বিশ্বাসকে নিগৃহীত করে। ঝাড়গ্রামে কিছু যুবক অবৈধ-

(৫০ পৃষ্ঠায় প্রকট)

পাদকীয়

‘হিত্য সৈকত’ এর জুলাই-সেপ্টেম্বর’ ৮৯ সংখ্যাটি এবারকার
সংখ্যা হিসাবে নিবেদিত হল। বহু কবিতা ও ছোট
গল্প ছাড়া এ সংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়ে পরিবেশিত হয়েছে
ফুলিয়া ও এস, কে, দে প্রসঙ্গে। বাইরের পাঠকের কাছে ফুলিয়া
ও এস, কে, দে খুব একটা আকর্ষণীয় রচনা হয়তো হবেনা তবে
ফুলিয়ার পাঠকদের কাছে এর আবর্ষণ যথেষ্ট হবে বলেই
আমাদের বিশ্বাস। ফুলিয়ার সঙ্গে, ফুলিয়ার মানুষদের সঙ্গে
এস, কে, দে’র একটা নিকট সম্পর্ক ছিল। গত মে মাসে তাঁর
মৃত্যু হয দিল্লীতে। এই এস, কে, দে’র হাতেই তৈরী ফুলিয়া
উপনগরী। এস, কে, দে এক সময় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন, ভারতের
হযে রাষ্ট্র সংঘের প্রতিনিধি ছিলেন কিছুদিনের জন্তে, এদেশে পঞ্চা-
য়েতী রাজ প্রবর্তনের একজন প্রবক্তা তিনি। বেশ কয়েকটি গ্রন্থের
প্রণেতা ও বহু প্রবন্ধের লেখক। আমাদের কাছে তাঁর রাজনৈতিক
আদর্শের চেয়েও জীবনাদর্শ বড়। মানুষ এস, কে, দে আমাদের
কাছে এক স্মরণীয় ও শিক্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁকে আমরা
আমাদের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে স্মরণ করার চেষ্টা করেছি।

এস, কে, দে যখন ফুলিয়া উপনগরী গড়ে তুলছিলেন তখন
অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁর কাজ কর্মের সহযোগী ছিলেন আই, সি,
সি, প্রশান্ত মজুমদার। প্রশান্ত মজুমদার অনেকদিন আগেই
মারা য়েছেন। তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী-ইলা মজুমদার বর্তমানে
পশ্চিম জার্মানীর মিউনিখে বসবাস করছেন। মিউনিখ থেকে
তিনি আমাদের চিঠি লিখেছিলেন এস, কে, দে সম্পর্কে লিখবেন
কেন। তার লেখা এখনও এসে আমাদের দপ্তরে পৌছায়নি।
এই পরবর্তী সংখ্যায় ছাপাবো। ফুলিয়াবাসী-সহ আমাদের
পাঠকদের কাছে অনুরোধ মানুষ এস, কে, দে কে যারা
কাছে থেকে দেখেছেন তাঁরা তাঁর স্মৃতিচারণ করতে পারেন।

SAHITYA SAIKAT

Rs. 4.00

July-Sept-89 (PUJA)

Regd. No. 42112/81 R. N. I.

কুষ্টিবাসির ফুলিয়া জ্ঞান সর্বজন

টান্জাইল শাড়ী তার গল্পের ঘন

পুজায় টান্জাইল শাড়ীর বিপুল সম্ভার

আমাদের ঠিকানা পরিবর্তন হয়েছে। এখন ফুলিয়া

রেল স্টেশনের আরো কাছে নিজস্ব বাড়িতে—

★ আমুন “সমবায় সদন” এ ★

ফুলিয়া টান্জাইল শাড়ী বয়ন শিল্প

সমবায় সমিতি লিঃ

টান্জাইল উল্লুজীবী উন্নয়ন সমবায় সমিতি লিঃ

সম্পাদক : মাধব ভট্টাচার্য

প্রকাশ স্থান

সার্কুলেশন ম্যানেজার :

সৈকত সন্নী, ফুলিয়া, নদীয়া

গণেশ রায়

প্রকাশক : কাকলি ভট্টাচার্য

মুদ্রণ-মায়া প্রেস, কাকিনাড়া